মেরুপথের যাত্রীদল

—পরিমল গোস্বামী

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৩৬৩

প্রকাশক : শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়
রাইটার্স সিণ্ডিকেট
প্রাইভেট লিমিটেড
৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৩

মুদ্রক : শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিমিটেড
৮/১ লালবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১

প্রচ্ছদ পট : শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

মানচিত্র : শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

॥ মূল্য : এক টাকা আট আনা ॥

ভূমিকা

দুর্গম পথের যে-কোনো অভিযানের কাহিনী আমার মনে বিস্ময় জাগায়, তাই আমি যত্ন ক'রে সব পড়ি। ফ্র্যাঙ্কলিনের অভিযানে মানুষের দুঃখভোগের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, —মানুষের সহ্য করার শক্তির, মনে হয়, সেইটিই শেষ কথা। আরও আমার বিশ্বাস দুঃখী মানুষের বাস্তব চিত্র আঁকতে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর গোল্ড রাশ ছবিতে ফ্র্যাঙ্কলিনের মেরু অভিযান থেকেই সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁর জুতো রান্না ক'রে খাওয়ার ছবিটি কাল্পনিক নয়।

আমার অভিযান-কাহিনী-পাঠের বিস্ময় বাংলার তরুণদের মনে কিছু পরিমাণ সঞ্চার করাই আমার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য এর সকল তথ্যই ইংরেজী বই থেকে নেওয়া।

কলিকাতা — লেখক

এপ্রিল ১৯৫৭

শ্রীমান্ জয়ন্ত আচার্য

তুমি ১৯৫৩ সালে, ন' বছর বয়সে, হ্যাম্পস্টেডের শূন্য বাড়িতে স্কুল থেকে ফিরে এসে একা রান্না ক'রে খেতে। দুটি বছর এইভাবে কাটিয়ে তুমি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছ তা স্মরণীয় করার জন্য এই বই তোমাকেই দিলাম।

বড় মামা

উত্তর মেরু
৮০°
গ্রীনল্যান্ড
কপারমাইন
ফোর্ট
স্লেভ
এন্টারপ্রাইস
লেক
ফোর্ট প্রভিডেন্স
মার্বেল দ্বীঃ
হাডসন
উঃ সাঃ
আথাবাস্কা
হ্রদ
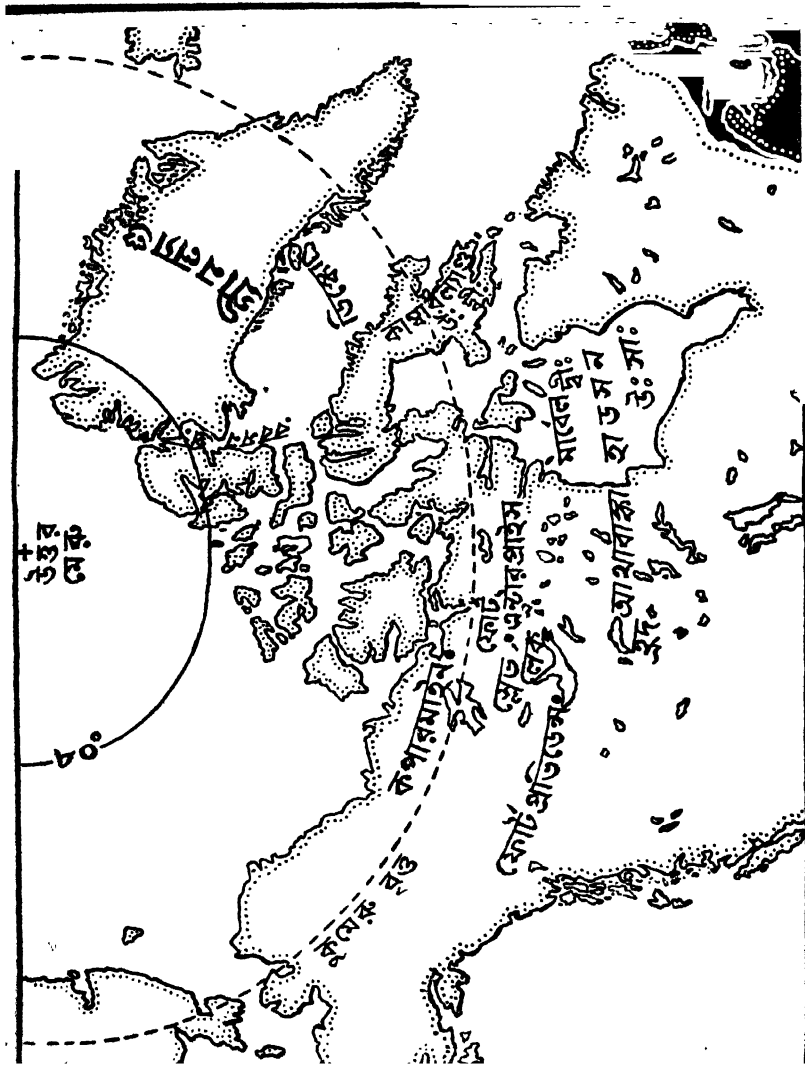
ফ্র্যাঙ্কলিনের অভিযান

ঘরছাড়া জীবন। কোথায়ও বাধা নেই, সীমাহীন আকাশের নিচে শুধু তরল পথ, শুধু ভেসে বেড়ানো।

কখনো রোদে ঝলমল হাসি-উচ্ছল দিনে, কখনো বজ্রবিদ্যুতের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন দুর্যোগের রাতে, কখনো অলস মন্থর গতিতে, কখনো উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে। তবু তৃপ্তি নেই।

নৌ-বিভাগে নিযুক্ত থেকে যুদ্ধের মতো দুঃসাহসিক কাজও তো করা গেল, কিন্তু সে যুদ্ধ তো মানুষের বিরুদ্ধে!

ঐ যে অজানা উত্তর মেরুদেশ, যেখানে কঠিন হিমের চিরস্তব্ধ চিরশুভ্র বাস—

ঐ যেখানে মাটির চিহ্ন নেই, পথের চিহ্ন নেই—

সেইখানে কি যাওয়া যায় না একবার? কি রহস্য লুকিয়ে আছে সেখানে, দেখা যায় না একবার?

ভয়ের রাজ্য কি সেটা?

দিনহীন, রাত্রিহীন, প্রাণীহীন, দয়াহীন রাজ্যে কোন্ সে নিষ্ঠুর হিমদেবতা একা বাস করে?

দেখা যায় না তাকে?…

দেখতেই হবে, যে দেশ কেউ দেখেনি, সেই দেশ দেখতে হবে।…

মন নেচে ওঠে কল্পনাতেই।

দুঃখ? মৃত্যু?

লোকে একথা ভাবে বটে কোথায়ও পা বাড়াবার আগে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের মনেও কি সে ভাবনা আছে?

নেই।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবেন তিনি। তুষারের ধূ ধূ মরুভূমির মাঝখানে একা তিনি।

কিন্তু কিসের জোরে?

সামান্য আঘাতে যে মানুষ ভেঙে পড়ে, সে কি না অন্ধ নিষ্ঠুর এক মহাশক্তির সঙ্গে লড়াই করতে চায়! মানুষের হাতপায়ের জোর কতটুকু? বিরাট অন্ধ শক্তির কাছে আবার দেহের বল!

কিন্তু তার মনের বল? তার শেষ পরীক্ষা তো আজও হয়নি। সেই বলকে কি কেউ দমন করতে পারে? জগতের কোনো অন্ধশক্তি কি তা পারে?

দেখতে হবে পরীক্ষা ক'রে।

বত্রিশ বছরের যুবক ফ্র্যাঙ্কলিনের মনে স্বপ্ন জেগে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ে বীরত্বের পরিচয় নেই। দৈহিক শক্তির খেলা দেখিয়ে মানুষ বীর ব'লে পরিচয় দিতে চায়, কিন্তু তাকে বীরত্ব বলে না। ও হচ্ছে হাতপায়ের কৌশল মাত্র। ও শুধু স্বাস্থ্যচর্চা মাত্র, এবং খেলার নামে অনেক সময়েই শুধু মত্ততা। এই মত্ততার মধ্যে মানবজাতির স্থায়ীভাবে হিত হয় এমন কিছু নেই, ওর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নেই, নিজ হাতে কিছু গড়ে তোলার তৃপ্তি নেই, ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে ওতে ছোট্ট বাহাদুরি আছে, সার্কাসের খেলায় যেমন থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র দৈহিক কৌশলের প্রদর্শনী খুলে যারা খুশি হয়, তাদের

সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। ছোট মন ছোট জিনিসে তৃপ্তি পায়।

ফ্র্যাঙ্কলিন সেই সরু গলিপথের পথিক নন। তাঁর পথ হবে অজানা পৃথিবীর দিগন্ত বিস্তৃত, তাঁর লড়াই প্রকৃতির সঙ্গে।

ফ্র্যাঙ্কলিনের মন জানা-জগতের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে অস্থির হয়ে ওঠে। মন অজানা জগতের রহস্য ভেদ ক'রে পরিচিত পৃথিবীর সীমা বিস্তার ক'রে দেবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তুষারে ঢাকা থাকবে প্রকৃতির রহস্য? আর মানুষ তাই চুপ ক'রে মেনে নেবে?

তাঁর শিরায় শিরায় রক্ত নেচে ওঠে, রক্তের স্রোত বুকে ধাক্কা মেরে ব'লে ওঠে—না না না।

ফ্র্যাঙ্কলিন মনে মনে কঠিন শপথ করেন।

মৃত্যু?...

কিন্তু ঘরে ব'সে থাকলেই কি মৃত্যুকে এড়ানো যায়? কাপুরুষেরা কি মরে না?

ফ্র্যাঙ্কলিনের দিন কাটতে লাগল অস্থির ভাবে। অবশেষে এক সুযোগও জুটে গেল তাঁর। ক্যাপ্টেন বুকানের অধীন কয়েকজন অভিযাত্রী উত্তর মেরুর ভূমি আবিষ্কারের কাজে যাচ্ছিলেন, ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁদের দলে ভিড়ে পড়লেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতে তাঁর ইচ্ছাপূরণ হল না।

এই অভিযানের কতকগুলো জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়াতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, বাকী জাহাজগুলো মাঝপথ থেকে ফিরে এলো বাধ্য হয়েই। ফ্র্যাঙ্কলিনের মন সাময়িকভাবে আশাভঙ্গের দরুন কিছু দমে গেল। কিন্তু সে নিতান্তই সাময়িকভাবেই,

কারণ এই ব্যর্থতা তাঁকে আরও বেশি অস্থির ক'রে তুলল, মেরুপথের এই একটুখানি স্বাদ তাঁকে যেন পাগল ক'রে তুলল।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন কি ভাগ্যবান। একটি বছর কাটতে না কাটতেই এক সরকারী অভিযান চলল মেরু প্রদেশে, ফ্র্যাঙ্কলিন পেলেন তার নেতৃত্বের ভার।

স্বপ্ন হঠাৎ সত্য হয়ে উঠল।

১৮১৯ সালের ২২মে। হাডসন্স বে কম্পানির জাহাজ—নাম প্রিন্স অব ওয়েলস্।

কানাডার উত্তরে হাডসন উপসাগরের ধারে ব্রিটিশ রাজ্যের ব্যবস্থায় এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এরই নাম হাডসন্স বে কম্পানি। মার্কিন-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসাই ছিল এদের উদ্দেশ্য এবং ঐ সঙ্গে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার। এই সঙ্গে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী কম্পানিরও প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে।

ফ্র্যাঙ্কলিন এই হাডসন্স বে কম্পানির পক্ষ থেকে অনাবিষ্কৃত প্রদেশসমূহ আবিষ্কারের কাজে যোগ দিলেন।

এই হাডসন ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিনের মতোই এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী, ফ্র্যাঙ্কলিনের পূর্বগামী।

সেও এক মর্মান্তিক কাহিনী। ফ্র্যাঙ্কলিনের চোখে ভেসে উঠল সেই ছবিটি—তাঁর দৃষ্টি দুশো বছর পিছিয়ে গেল :

হেনরি হাডসন তাঁরই মতো অজানার সন্ধানে বেরিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চলেছেন। চলেছেন তিনি ডিস্কাভারি নামক ছোট্ট জাহাজের নেতৃত্ব নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ড আবিষ্কার করতে। তাঁর সঙ্গে চলেছে তাঁর সাত বৎসরের পুত্র!

হাডসনের অভিযানে আমেরিকার উত্তরে আবিষ্কার হল এক মস্ত বড় উপসাগর। তাঁরই নামে এর নাম হয়েছিল 'হাডসন্স বে'।

তাঁর চলার পথে এসে পড়ল শীতকাল। চারদিকে জলে স্থলে বরফ জমতে লাগল, জাহাজ হল অচল। বরফে বরফে পথ হল দুর্গম।

হাডসনের মনে ভয় জাগল। জাহাজের নাবিকেরা তো ভয়ানক কষ্ট পাবে! কারণ এইখানেই প'ড়ে প'ড়ে কাটাতে হবে শীতকালটা, কোথায়ও নড়বার উপায় নেই।

সেই জনহীন দেশে ভীষণ শীতে আটকা প'ড়ে নাবিকেরা সত্যিই অস্থির হয়ে উঠল। খাবার যা সঙ্গে ছিল ফুরিয়ে এলো অল্প দিনের মধ্যেই। কি মারাত্মক অবস্থা! নাবিকেরা তো আর দেশ আবিষ্কার করতে আসেনি, তাই তারা সেই অবস্থার জন্য দায়ী করতে লাগল হাডসনকে। তারা আসলে ছিল মূর্খ, ভীরু। তাই খাবারের বরাদ্দ কমে যেতেই তারা ক্রমশ নিজমূর্তি ধারণ করল, তারা হয়ে উঠল অমানুষ, বর্বর। সেদিন তারা যে নৃশংস কাজ করেছিল, অভিযানের ইতিহাসে তার চেয়ে নৃশংস ঘটনা কমই ঘটেছে।

তারা একদিন ষড়যন্ত্র ক'রে হাডসন, তাঁর সাত বৎসরের পুত্র, আর কয়েকজন অসুস্থ অসহায় নাবিক সমেত বরফের ঘায়ে ঘায়ে দুর্বল জাহাজখানাকে ঠেলে ভাসিয়ে দিল বরফের টুকরোয় আচ্ছন্ন সেই উপসাগরের জলে, জাহাজ থেকে কারো আর তীরে আসবার উপায় রইল না।

তারপর?

তারপর তাঁদের কি হল তা কেউ জানে না। অসহায় হাডসন,

হাডসনের পুত্র, আর ক'জন নাবিক, চির জীবনের মতো পরিচিতের সীমানা পার হয়ে কোন্ অতলে তলিয়ে গেলেন আজও তার সন্ধান মেলেনি।

ফ্র্যাঙ্কলিন শিউরে উঠলেন। বেদনায় তাঁর চোখে জল এলো। এই পরিণাম তো তাঁরও হতে পারে!

ফ্র্যাঙ্কলিন সাময়িক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বিপদ? বিপদ আছে বলেই তো অজানার এত আকর্ষণ।

অজানার পথে চলতে চলতে শীত আসবেই, কারণ এ তো আর আজকের দিনের মতো দ্রুতগামী জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটর বা এয়ারোপ্লেন নয়। দাঁড় টেনে টেনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া জাহাজ। এ এক অসীম ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা।

মেরুদেশের শীত কল্পনা করা অসম্ভব। আবহাওয়ার তাপ কমতে কমতে যত ডিগ্রীতে জল জমে বরফ হয়, তাপের ডিগ্রী তার থেকেও কমতে থাকে। তখন তাকে বিয়োগ চিহ্নের সাহায্যে দেখাতে হয়। তখন তাপ নামতে থাকে উল্টো দিকে। বরফ জমে ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে (অথবা ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে)। তার চেয়ে এক ডিগ্রী নামলে ০-এর নিচে এক ডিগ্রী, অথবা—১ ডিগ্রী। এই ভাবে নামতে নামতে উল্টো দিকে অর্থাৎ ক্রমেই বিয়োগের দিকে চলে যায়। সুতরাং এ রকম ভয়াবহ ঠাণ্ডায় অনভ্যস্ত মানুষের যে-কোনো পরিণামই হতে পারে।

ফ্র্যাঙ্কলিন হাডসনের পরিণাম ভেবে আদৌ দমলেন না। বরঞ্চ তাঁর উৎসাহ আরও বেড়েই গেল।

কারণ ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন প্রকৃত বীর। মৃত্যুভয় প্রকৃত বীরের থাকে না।

তাঁকে কত রকম অজানা বিপদে পড়তে হবে তা তিনি জানতেন। কারণ একে তো জনহীন অনাবিষ্কৃত দেশ, তার উপর আবার ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কোথায় থাকবেন, কত দিন থাকবেন, খাবার ফুরিয়ে গেলে কি হবে কিছুরই ঠিক নেই, সবই অজানা অনিশ্চিত। কিন্তু প্রকৃত বীর এই অনিশ্চয়তার কল্পনাতেই একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করেন।

অজানা দেশ তিনি প্রথম আবিষ্কার করবেন, সেখানে কত কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা দেখবেন, এবং সংগ্রহ ক'রে আনবেন কত খবর কত তথ্য, যার সন্ধান আজও কোনো মানুষ পায় নি। তাতে মানুষের জ্ঞান বিস্তার হবে, কত সম্পদ আনবেন যা মানুষের ভোগে আসবে। তাই তো সে দেশ চুম্বকের মতো তাঁর মনকে টানছে।

কিন্তু এ কাজে তিনি সম্পূর্ণ একা নন। তাঁর সঙ্গে আছেন ডাক্তার রিচার্ডসন, লেফটেনাণ্ট ব্যাক, হুড নামক এক তরুণ যুবক এবং আরও অনেকে। প্রথম দু'জন ফ্র্যাঙ্কলিনের পূর্ব সহচর।

১৮১৯ সালের ৩০শে অগস্ট তারিখে হাডসন উপসাগরে নির্মিত এক কারখানায় এসে পৌঁছলেন এঁরা। ৯ই সেপ্টেম্বর যাত্রা করলেন অভিযানে। অনেক সময় হ্রদ কিংবা নদীপথে চলতে হবে বিবেচনায় সঙ্গে নিলেন বহনযোগ্য ছোট ছোট ক্যানূ নামক নৌকো।

এই সব অঞ্চলে যাঁরা ইতিপূর্বে আবিষ্কার অভিযান চালিয়ে গেছেন, তাঁরা এক এক জায়গায় এক একটা বিশ্রামের জায়গা গড়ে রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ যাত্রীর সুবিধার জন্য। কিন্তু দেশের মোট বিস্তার যতটা, তার তুলনায় অতি সামান্য অংশই ইতিপূর্বে আবিষ্কার করা হয়েছে, তাই আবিষ্কৃত জায়গার ছোট্ট পরিধিটুকুর মধ্যে এ রকম

আড্ডার সংখ্যা খুব বেশি নয়। এইগুলোকে কেন্দ্র ক'রে এগিয়ে যেতে হবে; অসুবিধা হলেই সেখানে ফিরে আসতে হবে; এবং সম্ভব হলে আরও নতুন বিশ্রামের জায়গা তৈরি করতে হবে।

ফ্র্যাঙ্কলিনের দল কাম্বারল্যাণ্ড হাউস নামক এই রকম একটা আড্ডায় পৌঁছে প্রথমেই এক বাধার সম্মুখীন হলেন।

পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী এইখানে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী এবং অন্যান্য দরকারী জিনিসের একটা চালান এবং কয়েকজন শিকারী ও পথ প্রদর্শকের আগেই এসে পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা ওখানে পৌঁছে দেখলেন সেখানে কোনো খাদ্য-সামগ্রীও নেই, কোনো লোকও নেই। কথামতো কিছুই এসে পৌঁছায় নি।

এর কারণ এই বোঝা গেল যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কম্পানিগুলোর মধ্যে যে ঝগড়া চলছে তারই ফলে এই কাণ্ড। অর্থাৎ ঝগড়ায় মেতে থাকার দরুন সময় মতো বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি।

এ এক মহা সমস্যা। যাত্রার প্রথমেই এত বড় বাধা।

কিন্তু এ বাধা মানা হবে না। নতুন অবস্থায় নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। আরও মুশকিল হল এই যে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে শীত-কাল শুরু হয়ে গেছে। এ সময় অভিযাত্রীদের এখান থেকে আরও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই ঠিক হল ডাক্তার রিচার্ডসন দলবল নিয়ে কাম্বারল্যাণ্ড হাউসেই থাকবেন, আর ফ্র্যাঙ্কলিন, ব্যাক ও হেপবার্ন নামক এক নাবিক আরও উত্তরে আথাবাস্কা হ্রদের তীরে অবস্থিত চিপিউয়ান ফোর্টে গিয়ে উঠবেন। এই আড্ডাটি ওখান থেকে ৮৫৭ মাইল দূরে।

ফ্র্যাঙ্কলিন যে সময়ে কাম্বারল্যাণ্ড হাউস থেকে রওনা হলেন, সে সময়টা প্রবল শীতের সময়, কারণ মাসটা ছিল ডিসেম্বর। বাইরে তখন ঘোরতর দুর্যোগ। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ঠিক এই সময়েই তাঁকে রওনা হতে হল। তাঁর সঙ্গে রইল ছোট্ট দু'খানা কুকুরে টানা মালপত্রবাহী স্লেজগাড়ি। অমানুষিক দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হল পথে। সুদীর্ঘ চারটি মাস এই দুর্জয় আবহাওয়ায় পথে পথে কাটিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন অবশেষে তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছলেন ১৮২০ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে।

এইখানে কয়েকমাস ব'সে ব'সে কাটানোর পর বাকী অভিযাত্রীরা এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁরা বসন্তকালে বরফ গলতে আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নৌকো চালাবার সুযোগ পেয়েই রওনা হয়েছিলেন।

এইখানে সবাই একত্র হয়ে অভিযানের পরামর্শ ও ব্যবস্থা করতে লাগলেন, এবং সব ঠিকঠাক করে নিয়ে তাঁরা ১৮ই জুলাই তারিখে গ্রেট স্লেভ হ্রদের উত্তরে অবস্থিত ফোর্ট প্রভিডেন্স নামক আড্ডার দিকে রওনা হলেন।

ওদিকে কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কম্পানিগুলোর লড়াই তখনও শেষ হয়নি, এবং উল্টে আরও এত বেড়ে গেছে যে শীঘ্রই হয়তো ওদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে উঠবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই এঁরা যখন রওনা হলেন তখন সেই আগের মতোই প্রায় খালি হাতে, কারণ খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতি তখনও এসে পৌঁছায় নি।

এমনি অবস্থায় অনাহার প্রায় নিশ্চিত জেনেও কি কেউ এমন বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়ায়?

অনিশ্চিত ভাবেই ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করলেন ফোর্ট প্রভিডেন্সের দিকে। সঙ্গে রইল শুধু এক দিন বা দুদিনের উপযুক্ত খাদ্য। সঙ্গে অবশ্য শিকারী ছিল, কিন্তু অন্যান্য সামগ্রীর মতো বন্দুকের বারুদেরও অভাব ছিল তাদের। শিকারীরা মাঝে মাঝে তাদের নিপুণ হাতে মাছ ধরতে লাগল এবং তারই সাহায্যে কোনো রকমে ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রে চলতে লাগলেন সবাই।

দলে সবসুদ্ধ আটাশ জন পুরুষ, তিনজন স্ত্রীলোক ও তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে। সঙ্গে আর আছে তিনখানা বড় নৌকো এবং স্ত্রীলোকদের জন্য একখানা ছোট নৌকো।

রওনা হবার কিছু পরেই আকাইশো নামক এক রেড ইণ্ডিয়ানের নেতৃত্বে আর একটি দল এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দিল। পথের দুর্দশা আরম্ভ হতে দেরি হল না। কয়েক দিন পরে কোনো একটা জায়গায় ব'সে ক্লান্ত ফ্রাঙ্কলিন ডায়ারিতে লিখছেন—"আজ আমাদের ভাণ্ডারে শুকনো মাংস যেটুকু ছিল তা শেষ হয়ে গেল, অন্য খাদ্যও অতি সামান্যই বাকী আছে, তাই আকাইশোর নির্দেশে শিকারীরা শিকারের অন্বেষণে বেরিয়ে গেল।"

এদিকে অনাহারের ভয় প্রতিদিন অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, জলে জাল ফেলে একটা মাছ পাওয়া যায় না, শিকারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ক্রমে সঙ্গীরা অধীর হয়ে ওঠে, তারা অভিযোগ জানায় এ ভাবে তারা আর চলতে পারবে না।

১১ই অগস্ট তারিখে ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর ডায়ারিতে লিখছেন, "ট্রাউট মাছ, শাদা মাছ, আর কৈমাছ অনেকগুলো ধরা হয়েছে কাল এবং আজ

সকালে, তাতে আমাদের দুবেলা বেশ খাওয়া হয়েছে, সঙ্গীদের অবসাদ কিছু দূর হয়েছে।”

আরও কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে দুদিন পর আর একটা হ্রদের ধারে ব’সে লিখছেন, “আজ সকালে দুটো মাছ ধরা হয়েছিল, কিন্তু দুটো মাছে এত লোকের পেট ভরে না। মাছ রান্নার সময় ক্যানাডীয় সঙ্গীরা এক কাণ্ড ক’রে বসল। ওরা ক’দিন ধরেই খুঁতখুঁত করছিল ভরপেট খেতে না পেয়ে, আর চেষ্টা করছিল আমাদের সবার খাবার কেড়ে নিয়ে একবারে খেয়ে ফেলতে। সেদিন ওরা তো স্পষ্ট বলেই বসল, ওরা আর চলতে পারবে না। ওদের সঙ্গে নিতে হলে আরও খেতে দিতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ শিকারীদের কাছ থেকে কিছু মাংসের ব্যবস্থা হওয়ায় আপাতত বিপদ কেটে গেল।”

কিন্তু বিপদ আর এক মূর্তিতে দেখা দিল এর পরে। ফ্র্যাঙ্কলিন ঠিক করেছিলেন এইখান থেকে কপারমাইন নদীপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করবেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় আকাইশোর একটি কথায় ফ্র্যাঙ্কলিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সে বলল, সে আর যাবে না।

ফ্র্যাঙ্কলিন তাকে যখন জানালেন, এত আয়োজন, এত তোড়জোড়, এত উৎসাহের পর এখন সব বন্ধ রাখা যায়? তখন আকাইশো বুঝিয়ে বলল, এখন যাওয়া মানে মরতে যাওয়া। শীতকাল প্রায় এসে পড়েছে, পাতা ঝরছে, পাখীরা পালিয়ে যাচ্ছে, এমনি অবস্থায় সে নিজে তো যাবেই না, শিকারীদেরও যেতে অনুমতি দেবে না!

ফ্র্যাঙ্কলিন প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি! শেষে তিনি আকাইশোর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, যাওয়া বন্ধ কিছুতে হতে পারে না।

আকাইশো তাঁর জেদ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হল।

"বেশ তাই হোক, আমি আমার সাধ্যমতো আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনি যখন আপনার এবং আপনার রেড্-ইণ্ডিয়ান সঙ্গীদের জীবন বিসর্জন দিতেই সংকল্প করেছেন, তখন আর আমার কিছু বলবার নেই। আমার এত অনুরোধের পরেও যদি আপনার সংকল্প না টলে তা হলে আমার কয়েকজন লোককে বাধ্য হয়েই আপনার সঙ্গে পাঠাতে হবে, কারণ এ কথা যেন আর শেষে না ওঠে যে আপনকে এত দূর টেনে এনে শেষকালে মৃত্যুর মুখে একা ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর কোনো দোষ নেই।"

ফ্র্যাঙ্কলিন চুপ ক'রে ভাবতে লাগলেন।

আকাইশো বলল, "আমার লোকেরা যে মুহূর্তে আপনার সঙ্গে নৌকোয় উঠবে, সে মুহূর্তে আমি ও আমার আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের মৃত বলেই ধ'রে নেব, এবং তাদের জন্য শোক প্রকাশ করব।"

এর পর ফ্র্যাঙ্কলিন আর তর্ক বা জেদ করলেন না, তিনি যাত্রা স্থগিত রাখলেন। আকাইশোর দিকটা এতক্ষণ তিনি ভাবেন নি, সেজন্য তাঁর কিছু দুঃখও হল।

ফ্র্যাঙ্কলিন ও আর সবাই একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেই খানেই ছোট্ট ছোট ঘর বেঁধে শীতকালটা কাটাবেন বলে স্থির করলেন। (পরে এই জায়গারই নাম হয়েছিল ফোর্ট এণ্টারপ্রাইস বা দুঃসাহসিক কর্মোদ্যমের দুর্গ)।

মাসের পর মাস কাটতে লাগল এইখানে—সুদীর্ঘ দশটি মাস। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করলেন। তারপর এলো যাত্রার সময়। কিন্তু তার আগে খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করতে হবে—

সেটাই হল প্রধান কাজ। এই কাজের ভার নিলেন লেফটেন্যান্ট ব্যাক।

ফ্র্যাঙ্কলিনের চোখে এর একশো বৎসর পূর্বেকার আর একটি করুণ ছবি ভেসে উঠল।—১৭১০ সালে আর এক দল হতভাগ্য ভৌগোলিক অভিযাত্রী কি ভাবে না খেয়ে মারা গিয়েছিলেন তারই হৃদয়বিদারক ছবিটি।

এই হতভাগ্য অভিযাত্রী দলের নায়ক ছিলেন জেমস নাইট। তাঁরা ১৭১৯ সালের জুন মাসে গ্রেভস-এণ্ড থেকে অ্যালবানি ও ডিস্কাভারি নামক জাহাজে দলবল দিয়ে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু আর ফিরে আসেন নি।

সে এক রহস্যময় অন্তর্ধান।

তাঁর চলে যাবার পর যখন তাঁদের কাছ থেকে অনেকদিন পর্যন্ত কোনো খবরই এলো না, তখন সবাই ধ'রে নিলেন তাঁর কাছ থেকে এ জীবনে আর কোনো খবরই আসবে না।

কিন্তু এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।—তাঁদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস অবশেষে জানতে পারা গেল পঞ্চাশ বছর পরে!

১৭৬৭ সালে সামুয়েল হেয়ার্ন নামক একজন লোক তিমি শিকার উপলক্ষে মার্বল দ্বীপে যান। তিনি দেখতে পান, সেই দ্বীপের কাছাকাছি জায়গায় প্রায় ত্রিশ ফুট জলের নিচে দুখানা জাহাজের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। দ্বীপটি মূল ভূখণ্ডের ষোল মাইল উত্তরে অবস্থিত; সেখানে শুধু শেওলা ও ঘাস ভিন্ন অন্য কোনো উদ্ভিদ নেই।

তিনি একদিন কয়েকজন বৃদ্ধ এস্কিমোর দেখা পান, এবং এক

দোভাষীর সাহায্যে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তাদের কাছ থেকে তিনি যে কাহিনীটি শোনেন তা এই—

পঞ্চাশ বছর আগে জাহাজগুলো যখন ঐখানে আসে তখন হেমন্তের প্রায় শেষ। জলে বরফ জমতে শুরু করেছে, তাই ওদের বড় জাহাজখানা বরফের ধাক্কায় ধাক্কায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোনো রকমে তীরে এসে জাহাজের শ্বেতকায় (এস্কিমোরা ইউরোপীয়দের শ্বেতকায় বলে) লোকেরা সেখানে শীত কাটানোর উপযুক্ত ঘর বাঁধতে শুরু করে। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন।

পরবর্তী গ্রীষ্মকালে এস্কিমোরা তাঁদের দেখতে যায়, এবং গিয়ে দেখতে পায় যে ইতিমধ্যেই তাঁদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে গেছে, এবং যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের স্বাস্থ্যও খুব খারাপ। তাঁদের মধ্যেকার মিস্ত্রীরা সে সময় কাঠ কেটে নৌকো তৈরি করছিল।

এরপর শীতকাল এলো। এস্কিমোরা থাকত বন্দরের অপর পারে। তারা মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁদের দেখে আসত। অবশ্য নিয়মিত দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তার কারণ তারা স্থায়ীভাবে এক জায়গায় কোথায়ও থাকত না। পরবর্তী শীতকালে যখন তারা তাঁদের দেখতে গেল, তখন অভিযাত্রীদের মাত্র কুড়িজন জীবিত। এই সময় বন্দরের অপর পারে এস্কিমোরা নিজেদের থাকবার জন্য বরফের ঘর তৈরি করছিল, তারা তাঁদের কাছে তিমির চর্বি, সীলের মাংস বা অন্যান্য কিছু কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দিত।

বসন্তকালে এস্কিমোরা সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়, এবং কিছুদিন পরে (১৭৭১, গ্রীষ্মকালে) ফিরে এসে দেখে তখন মাত্র পাঁচজন বেঁচে আছেন। এস্কিমোরা তিমির চর্বি ও সীলের মাংস সঙ্গে

নিয়ে গিয়েছিল। জীবিত রুগ্ন পাঁচজন অভিযাত্রীর দুর্দশা তখন এমনই ভয়ানক যে ঐ খাদ্যসামগ্রী পাবামাত্র রান্নার অপেক্ষা আর করতে পারলেন না, রাক্ষসের মতো কাঁচাই গিললেন। কিন্তু এ রকম খাদ্য, তার উপর আবার বহুদিনের অনাহার, তাই সে খাদ্য তাঁদের পেটে গিয়ে বিষ হয়ে উঠল, এবং ক'দিনের মধ্যেই পাঁচজনের তিনজন মারা গেলেন, বাকী দুজনের প্রাণটা বোধ হয় বেশি শক্ত ছিল, তাই তাঁরা তখনও বেঁচে রইলেন। মৃতদেহগুলি কবর দিলেন তাঁরা দুর্বল দেহে কাঁপতে কাঁপতে।

বহুদিনের অনাহারে শুকিয়ে, বহুদিনের নৈরাশ্যে, ভবিষ্যৎ হারিয়ে এবং চোখের সম্মুখে একের পর এক আটচল্লিশ জন বন্ধুর মৃত্যু দেখেও তখনও তাঁরা কোন্ শক্তিতে বেঁচে আছেন ভাবা যায় না। হয়তো তখনও আশা করছেন যদি দৈবাৎ কোনো জাহাজ সেই পথে এসে পড়ে!

তাঁদের আর কোনো কাজ নেই, কোথায়ও অনুসন্ধান করার মতো খাদ্য নেই, তাই প্রতিদিন তাঁরা একটা উঁচু জায়গায় উঠে যে পথে জাহাজ আসতে পারে সেই পথের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকেন। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত শূন্যতা। কখনো শুধু জল আর জল, কখনো শুধু বরফ আর বরফ। সেই বর্ণহীন শূন্যে চেয়ে চেয়ে চোখ অন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু জাহাজ আর আসে না। সমস্ত দিন চেয়ে থাকেন উন্মাদের মতো, সন্ধ্যা হয়ে আসে, চোখের সম্মুখে সকল দৃশ্য মিলিয়ে যায়, তখন টলতে টলতে নেমে এসে দুজন শিশুর মতো কাঁদতে থাকেন।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলে? কঠিন প্রাণের কঠিনতা একদিন ভেঙে গেল, ওঁদের একজন একদিন ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আর একজনও বন্ধুর দেহ

কবর দেবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন, চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো, তারপর—

চিরদিনের মতো পৃথিবীর আলো তাঁর চোখ থেকে নিবে গেল, বন্ধুর মৃতদেহের পাশে পড়ে রইল তাঁর প্রাণহীন দেহটি।...

তিমিশিকারী হেয়ার্ন পঞ্চাশ বছর পরে গিয়েও সেখানে তাঁদের মাথার খুলি ছুটি দেখতে পেয়েছিলেন।

কাহিনীটি স্মরণ ক'রে ফ্র্যাঙ্কলিনের মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

ব্যাক খাছের অন্বেষণে যাত্রা করলেন ঘোর শীতের মধ্যে। সঙ্গে মাত্র বেণ্টসেল, দুজন ক্যানাডীয় ও সস্ত্রীক দুজন শিকারী। ফ্র্যাঙ্কলিন পড়ে রইলেন ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে। কথা হল, ব্যাক কাম্বারল্যাণ্ড হাউস ও স্লেভ লেক অঞ্চল থেকে খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করে পাঠাবেন।

পথ চলতে ব্যাকের বড়ই দুশ্চিন্তা হচ্ছে সঙ্গীদের জন্যে। পথে খাবেন কি? যে পথে তাঁরা চলেছেন, সে পথে উদ্ভিদের চিহ্ন নেই,—শূন্য পাহাড়ী পথ। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকাতে চলতে হচ্ছে ধীর গতিতে। প্রথম দিন তাঁরা মাত্র সাড়ে সাত মাইল যেতে পারলেন।

আরও একদিন পরে আবহাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠল। কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন, সম্মুখের পথ দেখা যায় না, শিকারীদের মনে ভয় জেগে উঠছে, কি জানি যদি পথ হারিয়ে বিপথে গিয়ে পড়ে!

ব্যাক চলেছেন তাঁর লক্ষ্য পথে। চলেছেন শত শত বাধা অগ্রাহ্য ক'রে। চলেছেন কখনো শীতে-জমা হ্রদের উপর দিয়ে, কখনো উঁচু পাহাড়ের রুক্ষ পথ দিয়ে।

সঙ্গীরা অনুগত বন্ধুর মতো অনুসরণ করছে তাঁকে। ক্ষুধার্তদের জন্য খাদ্য চাই। যাঁরা তাঁদের পথে চেয়ে বসে আছেন একান্ত অসহায় ভাবে, তাঁদের জন্য খাদ্য চাই। মনে একাগ্র নিষ্ঠা, মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ, পায়ের নিচে ধূ ধূ তুষার মরু, সম্মুখে চিহ্নহীন পথ।

এগিয়ে চলেছেন তাঁরা।

হ্রদের উপর দিয়ে হাঁটা খুবই বিপজ্জনক, কারণ সব অংশ কঠিন ভাবে না জমলে যখন-তখন সেই কনকনে ঠাণ্ডা জলে ডুবতে হবে।

১৮ই অক্টোবর ব্যাক ও সঙ্গীদল ফোর্ট এণ্টারপ্রাইস ছেড়েছিলেন, তাঁরা ন'দিনের মধ্যে দুটি হ্রদ ও অনেকগুলো পাহাড় পার হলেন এবং যে হ্রদ তখনও জমেনি তাকে চক্রাকারে ঘুরে অনেকটা দূর এগিয়ে গেলেন।

এই সময় একদিন একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে। সঙ্গের স্ত্রীলোকদের একজন এক সময় বরফে গর্ত খুঁড়ে ভিতরে হাত চালিয়ে নিচের জল থেকে একটি 'পাইক' মাছ ধরে, কিন্তু সেই মাছটির কোনো অংশ সে নিজেদের জন্যে না রেখে সবটাই ব্যাককে খেতে দেয়। ব্যাক বললেন, "তা কেন? তোমরাও খাও।" স্ত্রীলোকটি তার উত্তরে সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "আমাদের জন্য ভাববেন না, আমাদের না খেয়ে থাকা অভ্যাস আছে, আপনার নেই।"

ঘটনাটি ছোট হলেও স্মরণীয়।

তারপর এঁরা এসে পৌঁছলেন ফোর্ট প্রভিডেন্সে। এইখানে এসে কিছুকাল ব'সে থাকতে হল, কারণ এর পর তাঁদের গ্রেট স্লেভ হ্রদ পার হতে হবে। এই হ্রদটি তখনও জমেনি

এখান থেকে যাত্রা সম্ভব হল ৮ই ডিসেম্বর তারিখে। সঙ্গে চলছে কুকুরটানা মালবাহী সেজগাড়ি। দারুণ শীত, হ্রদের উপর দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ জলের উপরের স্তরটি যখন জমতে থাকে, তখন প্রকাণ্ড এক এক টুকরো বরফ ঢেউয়ের ঘায়ে ভীষণ বেগে শূন্যে ছুটে যায়। তারই আঘাতে তাঁরা বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

তার উপর ছিল হ্রদের বিস্তীর্ণ খোলা জায়গার হাওয়া। দ্বিতীয় দিন থেকে এই হাওয়ার তীব্রতা খুব বেড়ে গেল, এবং ব্যাক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁকে কম্বল এবং হরিণের ছাল জড়িয়ে সেজগাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া ভিন্ন আর উপায় রইল না। শুধু চোখ দুটি খোলা রইল, যাতে উঁচু বরফের ধাক্কা লাগার সময় তিনি সাবধান হতে পারেন।

কিন্তু তবু সব বিপদ এড়ানো গেল না। মানুষ সাবধান হল, বিপদে পড়ল কুকুর। বরফের জমির এক জায়গায় এক ফাটলের মধ্যে তারা প'ড়ে গেল জলে। কি দুর্দশাটাই যে হল তাদের। কিন্তু তবু ভাল যে তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল, নইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ঠাণ্ডায় জমে ম'রে যেত, আর তার ফলে মানুষেরাও বাঁচত কিনা সন্দেহ।

দিন শেষ হয়ে আসছে। প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলেছেন সবাই, কিন্তু তবু মাটির চিহ্ন কোথায়? উন্মাদের মতো খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল মাটি রয়েছে তাঁদের বাঁয়ের দিকে প্রায় চার মাইল দূরে। তখনি গতি ফেরাতে হল সেই দিকে, কিন্তু সেদিকে কি দুর্দান্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, এই ঠাণ্ডায় দুজন লোকের মুখ ও কান জমে অসাড় হয়ে গেল। ব্যাকের দু হাতে ছিল খরগোসের চামড়ার দস্তানা, তারই সাহায্যে তিনি

নিজের হিম-আক্রান্ত জায়গাগুলি ক্রমাগত ঘষে ঘষে রক্ষা করতে লাগলেন।

ব্যাক ও তাঁর সঙ্গীরা সন্ধ্যা প্রায় ছ'টার সময় স্টোনী দ্বীপের কাছে অবস্থিত এক মৎস্যজীবীদের আড্ডায় এসে রাত কাটালেন। ক্যানাডীয়রা তো তাঁদের দেখে অবাক। ওরা ধরেই নিয়েছিল ব্যাক মারা গেছেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, যে-হ্রদ তাঁরা পার হয়ে এসেছেন, সেটি তার একদিন আগেও তরল ছিল, জমেনি। সেই হ্রদ একদিনের মধ্যে কি ক'রে এতটা জমে গেল, তাও তারা ভেবে অবাক হল।

অতঃপর ব্যাক তাঁর প্রথম গন্তব্যস্থান মুস-ডিয়ার দ্বীপে গিয়ে যখন দেখলেন সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করা চলবে না, তখন তিনি অ্যাথাবাস্কা হ্রদের ঘাঁটিতে যাওয়া স্থির করলেন। কিন্তু এপথ আরও খারাপ। এ পথে তুষারপাত এতই গভীর যে, একদিকে যেমন তাঁদের প্রতি দশ মিনিট অন্তর কুকুরদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, আর একদিকে তেমনি তাঁরা নিজেরা যাতে জমে না যান সেজন্য সবাইকে অল্পক্ষণ পর পরই দৌড়ে চলতে হচ্ছে। চলতে চলতে কুকুরের পায়ে কাঁচা ঘা দেখা দিল, পায়ে জুতো পরিয়ে কোনো ফল পাওয়া গেল না; তখন আর কোনো উপায়ই নেই দেখে তাঁরা নিজেরাই টানতে লাগলেন স্লেজগাড়িগুলো। এইভাবে কখনো উঁচু পথে, কখনো নিচু পথে, কখনো ভয়ানক হিম ঝড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলেন এবং জমে যাওয়া দেহের অংশগুলো ক্রমাগত ঘষে ঘষে ঠিক রাখতে লাগলেন। একটি জায়গা ঘষতে ঘষতে অন্য জায়গা জমতে থাকে, ফলে গাড়ি টানা ছেড়ে দিয়ে দুখানা হাত তাইতেই নিযুক্ত

রাখতে হয়। ব্যাকের হুখানা পা তো ফুলে উঠে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল, ভারী জুতো নিয়ে চলা সে অবস্থায় কি কঠিন!

যা হোক, এইভাবে একের পর এক অতি ভয়ানক অবস্থার মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে কোনো রকমে এড়িয়ে ব্যাক তাঁর সঙ্গীদেরসহ ২রা জানুয়ারি তারিখে ফোর্ট চিপিউয়ানে এসে পৌঁছলেন, এবং এইখানে এসে তাঁদের ভাগ্য অনেকটা সুপ্রসন্ন মনে হল। মনে হল যেন এইখানে তাঁদের খাদ্য সংগ্রহের কাজ ভালভাবে চলবে।

এই ভ্রমণ (ফোর্ট এণ্টারপ্রাইস থেকে ফোর্ট চিপিউয়ানে) শেষ করতে তাঁদের সময় লেগেছিল পুরো পাঁচ মাস এবং এই পাঁচ মাসে তাঁদের তুষার জুতো পরে হাঁটতে হয়েছিল মোট ১১০৪ মাইল। গড়ে মাসে হুশো মাইলের উপর। কিন্তু কি ভয়ানক সেই অভিযান! রাত্রে জঙ্গলে বাস, গায়ে দেবার শুধু একখানা মাত্র কম্বল আর হরিণ ছাল, অথচ উত্তাপ ০ ডিগ্রীর নিচে প্রায় ৬০ ডিগ্রী! অর্থাৎ মাইনাস ৬০ ডিগ্রী। কখনো হু-তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহার। অভিযানের ইতিহাসে এই কাহিনীটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যাকের দৃঢ়চিত্তত্তা, হুর্জয় সাহস এবং সহিষ্ণুতা পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ বীরের সমান।

এদিকে ফ্র্যাঙ্কলিনের দিন কাটছে ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে। শীতকাল কেটে যাবার পর যখন নদী ও হ্রদের বরফ গ'লে তাতে নৌকো চলা সম্ভব হল, তখন তিনি আকাইশো ও তার রেড ইণ্ডিয়ান সঙ্গীদের কাছ বিদায় নিয়ে ১৪ই জুন (১৮২১) তারিখে তাঁর লক্ষ্যপথে যাত্রা করলেন। কথা হল, পরবর্তী শীতকালে আবার তিনি এইখানেই ফিরে আসবেন, অতএব এইখানে তখন যেন প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী জমা থাকে।

কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাব, এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী কাজ হয়নি এবং তার ফলে এক অতি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সমগ্র অভিযানের পক্ষেই তা হয়েছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ফ্র্যাঙ্কলিন কয়েকমাস ধ'রে মেরু সমুদ্রের উপকূল বরাবর ৬৫০ মাইল অবধি অনাবিষ্কৃত ভূমিতে তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ ক'রে আসন্ন শীতের মুখে আড্ডায় ফিরে আসা স্থির করলেন। এই অনুসন্ধান কাজে পর পর দুটি অন্তরীপ আবিষ্কার ক'রে তার নাম রাখলেন যথাক্রমে ব্যারো ও ক্রাইগুার, এবং ১৮ই অগষ্ট আরও একটি অন্তরীপ আবিষ্কার ক'রে তার নাম রাখলেন কেপ টার্ন এগেন। এই নামটি অর্থপূর্ণ। ফ্র্যাঙ্কলিন এইখান থেকেই ফিরে এসেছিলেন।

তাঁর গোড়ার দিকে ইচ্ছা ছিল কপার মাইন নদীপথে ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে ফেরা, কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং খাদ্য সামগ্রী কম থাকায় তাড়াতাড়ি আগে নিকটস্থ কোনো আড্ডায় ফেরাই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। প্রথমে এলেন এক নদীতে। (পরে তাঁর এক সহগামীর নামে এই নদীর নাম রাখা হয় হুড নদী)। তার পর নদীপথে যতদূর যাওয়া যায় গেলেন। সেইখানে তাড়াতাড়ি কয়েকটা জরুরি কাজ শেষ করলেন। কাজগুলি আর কিছুই নয়, নিজকে যথাসম্ভব হাল্কা করে ফেলা। এই উদ্দেশ্যে বড় নৌকোগুলো ভেঙে বহন যোগ্য ছোট ছোট নৌকো বানিয়ে নিলেন, এবং শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসের দিকে ছুটতে লাগলেন।

কিন্তু শীত কি একা? শত রকম বাধা তাঁকে অনুসরণ করছে। কি অমানুষিক বাধা, কি অভূতপূর্ব মনের বল, আর সহিষ্ণুতা। অভিযানের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি দুর্দশা ভোগের কাহিনী আজ পর্যন্ত লেখা

হয়নি। এই ভয়াবহ বিপদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একজন মানুষও কি ক'রে তীরে উত্তীর্ণ হতে পারে তা কল্পনা করা যায় না।' সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে বোধ হয় একটা পথ মিলে যায়। সে পথ আগে থাকতে ভেবে ঠিক করা যায় না, আঘাতে প্রত্যাঘাতে সে পথ আপনা থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সে পথে যে বেঁচে ফিরে আসতেই হবে এমন কথা নেই। অভিযানের সাফল্যও বোধ হয় অভিযাত্রীর বেঁচে আসার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। এ কথা অভিযাত্রীরাই প্রমাণ করেছেন তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে।

ফ্র্যাঙ্কলিন প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পথ আর ফুরোয়না। যাত্রার প্রথমেই বাধা এসেছিল। যেদিন সকালে রওনা হবেন তার আগের রাত্রি থেকে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, তার পর উঠল ঝড়। বিছানার মধ্যে একমাত্র কম্বল ভরসা, হিমের আক্রমণের পক্ষে তার কোনোই দাম নেই। ঝড়ের বেগ এত বেড়ে গেল যে, শেষে তাঁবুর মধ্যে এসে লাগতে লাগল তুষারের ঝাপটা, তুষারের স্রোত প্রবেশ করতে লাগল সেখানে। তাঁবুগুলো পর্যন্ত জমে গেল। তাঁবুর চারপাশে তুষার জমল তিন ফুট গভীর হয়ে, আর কম্বলের উপর কয়েক ইঞ্চি ক'রে। কল্পনা কর এই দুর্যোগে, মাইনাস্ ২০ ডিগ্রী তাপে বিনা আগুনে বাস! আগুন জ্বলছিল পেটে।

এর পরেও কি কেউ রওনা হতে পারে বিছানা ছেড়ে উঠেই? ফ্র্যাঙ্কলিন কিন্তু রওনা হয়েছিলেন। অবশ্য এক পা এগোতে না এগোতে তখনই পড়ে গিয়েছিলেন মূর্ছিত হয়ে। দুঃসাহসী ফ্র্যাঙ্কলিন তখন সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু তাঁর অপরাধ ছিল না। এ রকম ক্লান্তি,

অনাহার, ঠাণ্ডা এবং তুষার ঝড়ের আক্রমণ, সব এক সঙ্গে মিলে তাঁকে সাময়িক ভাবে অসহায় করে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব এক মুহূর্তের জন্যও মূর্ছিত হয়নি—কারণ এই রকম মরণাপন্ন অবস্থাতেও, যখন

স্যুপ খেতে অস্বীকার ক'রে বললেন, যেটুকু খাদ্য আছে তা সবার জন্য। তা তিনি একা খাবেন কি ক'রে ?

একটুখানি স্বার্থপরতা দেখালে কারোই মনে করবার কিছু ছিল না, সেই সই সময় তিনি তাঁর চরিত্রের এমন একটা দিক প্রকাশ করেছেন যা

মনে রাখবার মতো। তাঁর মূর্ছা যাবার সময় যখন দেখা গেল অবস্থা অতি কঠিন, তখন তাঁর জীবন রক্ষার প্রশ্নই সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল। তাই তিনি সামান্য চেতনা লাভ করতেই তাঁকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করার জন্য যখন একটুখানি সূপ খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরি মনে হয়েছিল, তখন তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন। বললেন, যেটুকু খাদ্য আছে তা সবার জন্য, তা তিনি একা খাবেন কি করে? অবশেষে অনেক অনুরোধের পর রাজি করানো সম্ভব হয়েছিল।

এ হল যাত্রা-পূর্ব ইতিহাস। অভিযানের অনিশ্চিত অন্ধকারময় দিনগুলির মধ্যে কতবার এমনি এক একটি মুহূর্ত মনুষ্যত্বের ক্ষণপ্রভায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে তার শেষ নেই।

যাত্রাপথে বিপদ কোথায়ও কমল না। সব সময়েই একটা না একটা বাধা লেগেই আছে।

ঝড়-বৃষ্টি আর তুষার ঠেলে চলেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন। তুষার এত গভীর যে, হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। হ্রদের সর্বত্র জল সমানভাবে জমেনি, এক এক জায়গায় পা ডুবে যায় হাঁটু পর্যন্ত, পোষাক যায় ভিজে। যারা নৌকো ঠেলে চলেছে, ঝড়ের ঝাপটায় তারা মাঝে মাঝে মাটিতে প'ড়ে যাচ্ছে। আছাড় খেতে হচ্ছে কত জায়গায়।

যে নৌকোখানা একটু বড় ছিল এক সময় সেখানা গেল ভেঙে। কি ভয়ানক কথা! কারণ অন্য নৌকোগুলো ভুল ক'রে এতই ছোট ক'রে তৈরি করা হয়েছে যে, তার সাহায্যে একটি নদীও পার হওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। হুড-নদী পার হবার সময় তার প্রমাণ পাওয়া গেল, নৌকো একটি লোকের ভারে তলিয়ে যেতে চায়, তখন তাঁরা দুখানা নৌকো একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে কোনো রকমে পারাপারের কাজ

চালিয়ে নিলেন। দারুণ ঠাণ্ডা জল, এদিকে কারো মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই জলে ভিজে উঠেছে, অতি-সাবধানীদের পোষাক ও কোমর অবধি ভিজে গেছে। আর সে কি শুধুই জলে ভেজা? তাকে বলা চলে তুষারে ভেজা, কারণ সে জল পোষাকের উপর জমে পোষাক সুদ্ধ শক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং হাঁটতে যে তাঁদের কি কষ্ট হচ্ছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু দুঃখের এইখানেই শেষ নয়। এখনওচ রম দুঃখ, কল্পনার অতীত দুঃখ বাকী আছে। সে কাহিনী সত্য বলেই তা অতি ভয়াবহ। সে এমন দুঃখ যে তার মধ্যে না পড়লে মানুষ হয়তো কোনো দিন বুঝতেই পারত না মানুষের সহিষ্ণুতার সীমারেখাটা কোথায়; আর সেই সীমা পার হয়ে গেলে ক'জন লোক মানুষ থাকতে পারে, ক'জন লোক পশুরও অধম হয়।

দিনশেষে ফ্র্যাঙ্কলিন ও তাঁর সঙ্গীরা বিশ্রামের জন্য যেখানে থামলেন, সেখানে তাঁদের প্রথম কাজ হল আগুনের তাপে জমে যাওয়া শক্ত জুতোগুলোকে গরম করা এবং নতুন জুতো পরা। তারপর অভিযানের রীতি অনুযায়ী তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ডায়ারি লিখতে বসলেন। ডায়ারি লেখা শেষ হলে সান্ধ্য প্রার্থনা। তারপর খাবার তৈরি ও শুয়ে পড়া। শুয়ে শুয়ে তাঁরা নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন কতক্ষণে নিজেদের গায়ের গরমে জমে-যাওয়া কম্বলের তুষার গলে গিয়ে কম্বল কিছুটা নরম হবে। তা না হলে ঘুমানো অসম্ভব। ফ্র্যাঙ্কলিন ডায়ারিতে লিখছেন—

"কত রাত্রি এমন কেটেছে যখন আমরা শুকনো কাপড়ে ঘুমোতে

পাইনি। যে দিন ভালো ক'রে আগুন জেলে জুতো শুকিয়ে নেওয়া

পেরো নামক একজন দাঁড়ী তার বহুকষ্টে সঞ্চিত নিজের বরাদ্দ থেকে একখণ্ড ক'রে মাংস বিতরণ করল।

যায় নি, সেদিন ভিজে জুতো পায়েই শুয়েছি, কেননা জুতো খুলে

রাখলে আরও বেশি শক্ত হয়ে যায়, সকালে তা আর পরা যায় না।…ক্ষুধার্ত লোকেরা যেখানে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে।”

১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে সকালে আগুন জ্বেলে তার চারপাশে সবাই জড়ো হয়েছেন এবং খাদ্য-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন এমন সময় তাঁদের দলের পেরো নামক একজন নৌকোর দাঁড়ী তার বহুকষ্টে সঞ্চিত নিজের বরাদ্দ থেকে এক খণ্ড করে মাংস সবাইকে বিতরণ করল। একজন দাঁড়ীর এই অপ্র্যাশিত উদারতায় তাঁরা সবাই বিস্মিত হলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁদের চোখ ছল-ছল করতে লাগল। তাঁরা আনন্দের সঙ্গে সেই মাংস খেতে লাগলেন।

কিন্তু খাদ্য-সমস্যা যে তাঁদের কি ভাবে পীড়িত করেছিল তা এর পরের কয়েকটি ঘটনায় বোঝা যাবে।

ইতিমধ্যে কয়েক দিন কেটে গেছে, এক কণা খাদ্য কারো পেটে পড়েনি—অথচ সেই দুর্গম পথে চলতে হচ্ছে বোঝা বয়ে বয়ে। এমন সময় ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো কয়েকজন লোক এক জায়গায় বরফের নিচে থেকে হঠাৎ এক ভোজের আয়োজন আবিষ্কার ক'রে ফেলল। অনাহারে শীর্ণ লোকদের কি সৌভাগ্য, কি আনন্দ! তাঁদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন তাঁরা।

সে এমনি এক অপূর্ব খাদ্য যার নাম শুনলে সবাই চমকে উঠবে। গত বসন্ত ঋতুতে কোনো নেকড়ে বাঘ একটি হরিণ মেরে খেয়েছিল, সেই হরিণের অভক্ষ্য অংশ, অর্থাৎ যা সেই নেকড়ে বাঘ খেতে পারেনি, তাই চাপা পড়ে গিয়েছিল বরফের নিচে। সে প্রায় এক বছর আগের ব্যাপার, বসন্তের পর গ্রীষ্ম এবং তারপর শীত এসেছে, কিন্তু তা হলে

কি হয়? তাঁরা নেকড়ে বাঘেরও অভক্ষ্য এবং উচ্ছিষ্ট সেই হাড় ও চামড়া পেয়ে নাচতে লাগলেন। সেগুলোকে তাঁরা পুড়িয়ে খাওয়ার উপযুক্ত করে নিলেন, এবং ঐ সঙ্গে কেউ কেউ তাঁদের পুরাতন জুতোও ভেজে ফেললেন। কি আনন্দ, কি কৃতজ্ঞতা!

ঠিক এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি আরও একদিন ঘটল এর পর। খাওয়ার এমন সহজ পথ আবিষ্কার হওয়াতে প্রাণটা বেঁচে রইল কোনো মতে। পুরাতন জুতোগুলো পা থেকে পেটে উঠতে লাগলো একে একে। এর পর যদি দৈবাৎ শিকারীর হাতে কোনো হরিণ মারা পড়ে তা হলে তো কথাই নেই। এই রকম মরীয়া অবস্থা হলে মানুষ এমন সব কাণ্ড করে বসে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এই পরিণাম জেনেও মানুষের মনের বল তাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয় না। দীর্ঘ ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল এই অভিযানই মানুষের শক্তির অদম্যতা প্রমাণ করেছে। তাই এ কাহিনী পড়তে বসলে আমরাও কল্পনায় নিজের মধ্যে সাময়িকভাবে সেই শক্তি অনুভব করতে পারি।

ফ্র্যাঙ্কলিনের পথে যেন দুর্ভাগ্যের মালা গাঁথা হতে লাগল। এই ভাবে চলতে চলতে তাঁর নৌকোখানা গেল ভেঙে। শেষ অবধি এই একখানা নৌকোই অবশিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় বাহকেরা সেই নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে অস্বীকার ক'রে বসল। তারা যেন আর মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। বহু অনুরোধ এবং অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও তারা রাজি হল না, সোজা বলল, নৌকো ঠেলার প্রবৃত্তি নেই তাদের। বেশ বোঝা গেল তারা বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

যা হোক, কোনো রকমে কপারমাইন নদীতে এসে সবাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন, নদীর কোনো অংশ অগভীর আছে কি না,

কারণ তাতে হেঁটে পার হবার সুবিধা হবে। কিন্তু কোথায়ও সে রকম কোনো অংশ পাওয়া গেল না। এখন উপায়? শীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোরা পথে হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়, তাই নদী পারের জন্য ভেলা

"কোনো চিন্তা নেই, আমি একগাছা দড়ি নিয়ে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে যাচ্ছি।

তৈরির দরকার হল। কাছেই অনেক উইলো গাছ ছিল, তাই কেটে তাঁরা কাজ শুরু করে দিলেন। কয়েকজন শিকারী শিকারের সন্ধানে গিয়ে আর এক ভোজের আয়োজন পাকা করে ফেললেন। জীবন্ত

শিকার নয়, তবে কারো উচ্ছিষ্টও নয়, একেবারে আস্ত এক হরিণের মৃত দেহ। পাথরের এক ফাটলে আটকা প'ড়ে কি ক'রে হরিণটা বছর খানেক হল মারা পড়েছিল, সুতরাং তার মাংস এতদিনে পচে উঠেছে। কিন্তু তবু মাংস তো? অভিযাত্রীরা মহা উল্লাসে সেই পচা মাংস পুড়িয়ে নিয়ে তার বারো আনা অংশ খেয়ে ফেললেন, এবং বাকীটা সঞ্চয় ক'রে রাখলেন ভবিষ্যতের জন্য। এই অপ্রত্যাশিত ভোজে চাঙ্গা হয়ে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে ভেলা তৈরির কাজে লেগে গেলেন।

যথা সময়ে ভেলা তৈরি হল, কিন্তু ভাসাতে গিয়ে দেখা গেল কাঠ-গুলোই কোনো রকমে ভেসে থাকে, তার উপর কেউ চাপলে ডুবে যায়। তার সাহায্যে বহু চেষ্টা করেও কেউ নদী পার হতে পারলেন না, তখন আবার সবার মন নিরুৎসাহে দমে গেল।

এমনি অবস্থায়, যখন ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, যখন অসহায় ভাবে মৃত্যু বরণ করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় কারো চোখে পড়ছে না, তখন এঁদের মধ্যকার একজন, যিনি আর সবারই মতো অতিশ্রমে এবং অনাহারে কাতর, তিনি হঠাৎ দুঃসাহসিক স্বার্থত্যাগের এমন এক মহৎ দৃষ্টান্ত দেখালেন, পৃথিবীর ত্যাগের ইতিহাসে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর এই মহত্ত্ব নৈরাশ্যের সেই ঘন অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এই স্বার্থত্যাগী মহৎ ব্যক্তিটি হচ্ছেন ডাক্তার রিচার্ডসন। তিনি বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, আমি একগাছা দড়ি নিয়ে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে যাচ্ছি, পারে গিয়ে দড়ি টেনে ভেলা পার ক'রে দেব।"

সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই অসম্ভব কথা শুনে। অবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও এমন একটি বেপরোয়া দুঃসাহসিক কাজ করতে কেউ সহজে রাজি হত না। অনাহারে তখন সবাই প্রায় ধুঁকছেন, প্রত্যেকেই কঙ্কালসার হয়ে পড়ছেন, এমন অবস্থায় বরফ-জমা জলে সাঁতার কেটে নদীপার হওয়া মানে জেনে শুনে মৃত্যুকে বরণ করা। তা ছাড়া এতে লাভই বা কি? যে উদ্দেশ্যে এমন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া, তা কি সফল হবে? তবু কেন এই ইচ্ছা?

ডাক্তার রিচার্ডসন জীবন বিপন্ন করেও দেখবেন, সঙ্গীদের দুঃখ দূর করা যায় কিনা। সবাই যেখানে সমানভাবে বিপন্ন, সেখানে চুপ ক'রে ব'সে না থেকে বিপদ দূর করার চেষ্টা করাই মনুষ্যত্ব। কিন্তু তবু এক এক সময় দৈব এমন প্রতিকূল হয়ে পড়ে যে, একটার পর একটা বিপদে মনের বল ভেঙে পড়তে চায়। এমনি অবস্থাতে অনেকে মনুষ্যত্ব-বোধ হারিয়ে ফেলে, স্বার্থপর হয়ে ওঠে, এমন কি পশুরও অধম হয়ে পড়ে। কিন্তু বীর্যবান যিনি, কোনো অবস্থাতেই তাঁর কোনো বিকার হয় না। স্বার্থপর হওয়াটাই যেখানে স্বাভাবিক, এবং হলে তাতে কেউ কিছু অপরাধ নেয় না, সেইখানে সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার ক'রে এক একটি মানুষ স্বার্থহীনতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান। আমরা তখন মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারি। এমনি মানুষ সকল দেশে সকল সমাজেই আছেন, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে চরম স্বার্থ ত্যাগ ক'রে মানুষকে সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে আমরা সেই একটি মাত্র মাছ বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রেড ইণ্ডিয়ানদের উদারতা দেখেছি। নিজের খাদ্যের অংশ বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে ক্যানাডীয় দাঁড়ীর মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছি। আর এখন দেখছি ডাক্তার রিচার্ডসনের মহত্ত্ব। কি কষ্টই না তিনি ভোগ করলেন বন্ধুদের জন্য!

নদীতে নামার আগেই এক দুর্ঘটনা ঘটল। হঠাৎ একখানা ছোরায় তাঁর পা এমন কেটে গেল যে, ছোরার ফলা হাড়ে গিয়ে ঠেকল। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে জলে গিয়ে নামলেন। কোমরে দড়ি জড়ানো অবস্থায় সেই হাড়-কাঁপানো কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটা কি কঠিন! অনাহারে দুর্বল শরীরের উপর এই কষ্ট কি সহ্য হয়? মন পারলেও দেহ অনেক সময় পারে না। রিচার্ডসন একটুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন, তাঁর একখানা হাত অবশ হয়ে আসছে, আর সাঁতার কাটতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎ হয়ে ভাসতে লাগলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ পরে তাঁর দুখানা পা একসঙ্গে জমে গেল, তিনি এবারে ডুবতে লাগলেন। এপারের সবাই তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ তাঁদের মনে পড়ল রিচার্ডসনের সঙ্গে তাঁদের দড়ির যোগাযোগ আছে, তবে আর ভাবনা কি?

তাঁকে দড়ি ধরেই টেনে আনতে হল এপারে। কিন্তু তখন তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা। তৎক্ষণাৎ তাঁকে একখানা কম্বলে জড়িয়ে উইলো কাঠের আগুনের পাশে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। পরে জানতে পারা গেল, এ রকম হিমাক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীকে এত উত্তাপের কাছে রাখা খুব অন্যায় হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার রিচার্ডসনের এতে গুরুতর ক্ষতি হয় নি। তিনি একটুখানি জ্ঞানলাভ করেই নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে শুশ্রূষাদি করতে হবে তার নির্দেশ দিলেন। তারপর সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার দিকে একটু শক্তিলাভ করায় তাঁকে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। পরে জানা গেল তাঁর দেহের বাঁ ধারের ত্বক সমস্তই একেবারে অসাড়

হয়ে গেছে, এবং হঠাৎ তাঁকে আগুনের পাশে রাখাতেই ও রকম হয়েছে। ডাক্তার রিচার্ডসনের জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তিনি সে সময় নিজেই তা নিষেধ করতে পারতেন। এই ব্যাধি সারতে তাঁর কয়েক মাস কেটে গিয়েছিল।

এর পরে অভিযানের কাজ এর চেয়েও অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। ফ্র্যাঙ্কলিনের অনুচর হুড ইতিমধ্যে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে পড়েছেন, তাঁকে আর চেনাই যান না, যেন তিনি জীবন্ত লোকের একটি ছায়ামূর্তি। ক্ষিধের জ্বালায় লাইকেন নামক এক পাহাড়ী উদ্ভিদ খেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কারণ পথ চলতে এক সময় পর পর ক'দিন ধরে সবাইকেই এই লাইকেনের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। ব্যাক এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, লাঠি ছাড়া এক পা হাঁটতে পারেন না। ডাক্তার রিচার্ডসন তো একেবারেই খোঁড়া হয়ে পড়েছেন। তদুপরি দিনের পর দিন অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে, খাওয়ার ইচ্ছাটাই যেন সবার নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ মজা এই যে, তবু একমাত্র খাওয়ার বিষয় ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় আলাপ করতেও কারো ভাল লাগছে না।

অবশেষে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে আরো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে উন্নত ধরনের আর একখানা ভেলা তৈরি করা হল, এবং এর সাহায্যে একে একে পার হওয়ারও আর কোনো অসুবিধা হল না। এতদিনের একটা বিভীষিকা যেন দূর হয়ে গেল নদী পার হওয়া সম্ভব হওয়াতে। আবার মনে আশা জাগল, নদী যখন পার হওয়া গেছে তখন ফোর্ট এণ্টারপ্রাইস তো হাতের মুঠোয়! অন্ততঃ এই কল্পনাতেই তাঁরা মেতে উঠলেন, কারণ সেখানে গেলে খেতেও পাওয়া যাবে। খাদ্য-সামগ্রী সেখানে এনে জমা ক'রে রাখতে রেড ইণ্ডিয়ানদের আগেই নির্দেশ

দেওয়া ছিল। এই খাদ্য আর কিছুই নয়—গলিত চর্বির সঙ্গে প্রস্তুত শুকনো মাংসের পিষ্টক, নাম পেমিক্যান।

কিন্তু সেই লক্ষ্যস্থল এখনও অনেক দূরে, নদীপারের আনন্দে সে কথা তাঁদের মনেই হয় নি। সেখানে যাবার আগেই যে তাঁদের খাদ্যের দরকার। সুতরাং খাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা চলতে লাগল। ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, "ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে যখন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে রাখার কথা আছে, তখন সেখান থেকেই কিছু এখানে আনিয়ে নেওয়া ভাল।" এজন্য তিনি ব্যাককে দুজন সঙ্গী সহ সেখানে পাঠালেন। তাদের ব'লে দিলেন, যদি রেড ইণ্ডিয়ানরা সেখানে না থাকে, তবে যেখানেই থাক তাদের খুঁজে বের করতে হবে। তারা কোথায় আছে তার সন্ধান বেণ্টস্লের চিঠিতেও পাওয়া যেতে পারে।

ব্যাক সঙ্গীদের সহ রওনা হয়ে গেলেন, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের দুশ্চিন্তা দূর হল না। তাঁর মনে হল তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হলে তাঁর নিজেরও যাওয়া দরকার। তাই তিনি হুড, ডাক্তার রিচার্ডসন এবং হেপবার্নকে তাঁদের নিজেদেরই অনুরোধে নদীপারে রেখে ছ'জন সঙ্গী সহ ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসের দিকে যাত্রা করলেন।

কিন্তু পথ চলতে গিয়ে দেখা গেল সবাই সমানভাবে হাঁটতে পারছেন না। বহুদিনের ঝড়-ঝাপ্‌টা অনাহার অনিদ্রায় সবার স্বাস্থ্যই ভেঙে পড়েছিল, কেবল ফ্র্যাঙ্কলিন ও আরও দু-চারজনের অসাধারণ মনের বল ছিল ব'লে এখনও পরাজয় স্বীকার করেননি। তাঁরা একদিন হাঁটার পরেই বুঝতে পারলেন, সবার পক্ষে পথ চলা সম্ভব হবে না, অন্তত দু'জন সঙ্গীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল, এবং বাধ্য হয়েই তাঁদের ফিরে আসতে হল পূর্বস্থানে। ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে রইল তখন

চারজন মাত্র অনুচর। তারা কোনো রকমে নিজেদের শক্তি বজায় রেখে চলতে লাগল। পথে যেখানে লাইকেন মেলে না, সেখানে তারা চা ও পুরাতন জুতো খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু হায়, এত দুঃখের পরেও ফ্র্যাঙ্কলিন সুখের মুখ দেখতে পেলেন না, কারণ

ডাঃ রিচার্ডসন গিয়ে দেখেন একটা আগুনের ধারে
হুডের মৃতদেহ পড়ে আছে।

ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে গিয়ে দেখেন জায়গাটা প্রায় মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করছে, সেখানে কোনো খাদ্যও নেই, কোনো মানুষও নেই, বেণ্টসেলের কোনো চিঠিও নেই। ফ্র্যাঙ্কলিনের চোখে জল এলো—নিজের জন্য

নয়, যাঁদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন সেই অসহায় বন্ধুদের জন্য। অবিলম্বে খাদ্য আসবে এই আশায় তারা যে দিন গুনছে।

ফ্র্যাঙ্কলিন ব্যাকের একখানা চিঠি পেলেন, চিঠিতে জানা গেল তিনি দু'দিন আগে এইখানে পৌঁছেছেন, এবং এখানকার অবস্থা দেখে ইণ্ডিয়ান-দের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন, যদি তাদের সন্ধান না পাওয়া যায়, তা হলে তিনি ফোর্ট প্রভিডেন্সে যাবেন এবং সেখান থেকে সাহায্য পাঠাবার চেষ্টা করবেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের মনে ভয় জাগল, তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাকের পক্ষে তা সহজ হবে না, তাই তিনি প্রাণপণে ইণ্ডিয়ানদের সন্ধানেই রত হলেন। তাঁর সঙ্গে রইল দু'জন মাত্র ক্লান্ত দুর্বল অনুচর। কিন্তু তাঁর নিজের তুষার-পাদুকা হঠাৎ ভেঙে যাওয়াতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়লেন, তাঁকে বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হল। এদিকে নষ্ট করবার মতো সময় নেই, অথচ হাঁটাও অসম্ভব, তাই তিনি দু'জন অনুচরের উপরেই ভার দিলেন তাদের অনুসন্ধান কাজের। তিনি নিজে আর দু'জন অনুচরসহ পড়ে রইলেন ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে।

দিনের পর দিন শক্তি ফুরিয়ে আসছে, সামান্য পরিশ্রম করতে হাঁফিয়ে উঠতে হয়, এবং এমন অবস্থা যে উঠতে গেলে পরস্পরকে ধ'রে উঠতে হয়, সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে ওঠা যায় না। তবু মনে আশা জাগছে, হয় তো ইণ্ডিয়ানদের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এমন সময় ২৯শে তারিখে সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার রিচার্ডসন এবং হেপবার্ন এসে পৌঁছলেন সেখানে। তাঁর যে কি ভয়াবহ এক অবস্থায় প'ড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তার কাহিনী শুনে ফ্র্যাঙ্কলিনের রক্ত হিম হয়ে গেল।

হুড ও মিচেল নামক একব্যক্তি মারা পড়েছেন, আর যে হু'জন অনুচর ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর হাঁটতে না পেরে ফিরে আসছিলেন তাঁরা তাঁবুতে ফেরেননি, তাঁদের কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। ঘটনা অতি ভয়াবহ। শুনলে স্তম্ভিত হতে হবে।

মিচেল তাঁদের হত্যা করেছে! সজ্ঞানে হত্যা করেছে নরপিশাচ মিচেল!—আর লুকিয়ে তাদের মাংস খেয়েছে! মিচেলের কথাবার্তা এবং চলাচলনে ডাক্তার রিচার্ডসন এবং হেপবার্নের সন্দেহ জাগে। সে শিকারেও যায় না, অথচ আপাতদৃষ্টিতে কিছুই না খেয়ে আশ্চর্যরূপে দেহের শক্তি বজায় রাখছে! এর কারণ কি? হু'জন লোকেরই বা হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ কি?—তুইয়ের কার্য-কারণ সম্বন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট।

ডাক্তার রিচার্ডসন ও হেপবার্ন এই সিদ্ধান্তই করলেন।

এমন সময় ২০শে অক্টোবর রবিবার সকালে ডাক্তার রিচার্ডসন হঠাৎ একটি বন্দুকের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে নানা রকম ভয় জাগল, এর মিনিট দশেক পরে হেপবার্ন ছুটতে ছুটতে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে তাঁকে বললেন, "শীগগির আমার সঙ্গে একবার আসুন, অবস্থা অতি ভয়ানক।"

ডাক্তার রিচার্ডসন গিয়ে দেখেন একটা আগুনের ধারে হুডের মৃত-দেহ পড়ে আছে, বন্দুকের গুলি তাঁর কপাল ভেদ করেছে। রিচার্ডসন প্রথমে ভাবলেন হুড হতাশায় আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু দেহ পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, গুলিটি মাথার পিছন দিয়ে ঢুকে কপাল দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মিচেলের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হল। সে বলল, হুড তাকে তাঁবু থেকে একটা খাটো বন্দুক আনতে পাঠিয়েছিলেন এবং তার

অনুপস্থিতিতে লম্বা বন্দুকটা থেকে কি ক'রে গুলি বেরিয়ে গেছে, হঠাৎ গেছে কি হুড ইচ্ছে ক'রে এ কাজ করেছেন তা সে জানে না।

হেপবার্ন ও ডাক্তার রিচার্ডসনের সন্দেহ রইল না যে, তাঁদের তরুণ বন্ধু হুড নিহত হয়েছেন। মিচেলের চালচলনে এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। তাঁরা স্থির করলেন, মিচেলের মৃত্যু ভিন্ন তাঁদের আর নিরাপদে থাকবার উপায় নেই।

হেপবার্ন বললেন, "এ কাজের ভার আমাকে দিন্।"

ডাক্তার রিচার্ডসন দৃঢ়স্বরে বললেন, "না, সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।"

দায়িত্ব তিনিই নিলেন। তাঁর পিস্তলের গুলি মিচেলের শির ভেদ করল।

ডাক্তার রিচার্ডসন তাঁর ডায়রিতে লিখছেন, "শুধু আমার একার জীবন বিপন্ন হলে এই মূল্য দিয়ে আমি তা কিনতাম না। কিন্তু হেপবার্নের জীবনরক্ষার ভারও আমার উপর ন্যস্ত আছে। সে তার করুণাধর্মে, নিষ্ঠায়, আমার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে, তাই আমি আমার নিজের অপেক্ষাও তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম বেশি।"

উপযুক্ত সময়েই মিচেলকে গুলি করা হয়েছিল, কারণ পরে দেখা যায় মিচেলের বন্দুকে আরও গুলি ছিল এবং সে হেপবার্ন ও ডাক্তার রিচার্ডসনকেও হত্যা করত।

দুর্দশার চরমে পৌঁছলে যারা পিশাচে পরিণত হয় মিচেল তারই একটি জঘন্য দৃষ্টান্ত। পেটের জ্বালায় সে তার বিশ্বাসী বন্ধুদের হত্যা ক'রে খেয়ে মনুষ্যত্বের উপরে কালিমা লেপন করে গেছে।

এই রকম সব খবর অভিযাত্রীদের মনে উৎসাহ জাগাতে পারে না। সবাই অন্তত সাময়িকভাবে দমে গেলেন।

আরও কয়েকদিন পর একজন দাঁড়ী অনাহারে মারা গেল। এর ছ'দিন পরে বহু-বাঞ্ছিত সাহায্য এসে পৌঁছিল। আকাইশোর আড্ডা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক কয়েকজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে অল্প কিছু খাবার পাঠালেন যাতে তারা খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারে। ইণ্ডিয়ানদের খুঁজে পাওয়াতেই বাকী লোকদের জীবন রক্ষা হল। ব্যাক এই কাজে যে দুঃখ ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনার অতীত। তিনজন সঙ্গী সহ তিনি কয়েকদিন ধ'রে চামড়ার ট্রাউজার, বন্দুকের চামড়ার খাপ ও পুরনো জুতো খেয়ে বেঁচে ছিলেন। এই অবস্থায় আরও একজন সঙ্গী পথে মারা গেল, এবং বাকী সঙ্গীদের নিয়ে ব্যাক যখন আকাইশোর আড্ডায় ফিরে এলেন, তখন তাঁদেরও প্রায় শেষ অবস্থা। ফোর্ট এণ্টারপ্রাইসে যে সাহায্য পাঠানো হয়েছিল তা পেয়ে ক্ষুধার্তরা কৃতজ্ঞতায় চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ৭ই নবেম্বর ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দুপুরবেলা ইণ্ডিয়ানরা খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে পোঁছে গেছে।"

আশ্চর্য এঁদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা। চারদিকে বিভীষিকা, প্রাকৃতিক ভয়াবহ প্রতিকূলতা, মহৎ সঙ্গীদের চোখের সম্মুখে একে একে মৃত্যু, অনাহার, অনিদ্রা, ব্যাধি, মানুষের পৈশাচিকতা। এই অন্ধকারময় দুর্যোগের মহাসমুদ্রে ছিন্নপাল ভগ্নহাল অভিযাত্রীরা মনে শুধু আশার আলো জ্বালিয়ে উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে-ভেসে চলেছেন। শুধু আশা—রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই।

ফ্র্যাঙ্কলিন ও তাঁর সঙ্গীরা এই অভিযানে মোট ৫৫৫০ মাইল ঘুরে-ছিলেন সেই সব ভয়াবহ দুর্গম পথে, এবং ঘুরে বহু ভূমি আবিষ্কার ও বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে পরবর্তী অক্টোবর মাসে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। ফিরে

আসার পর তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই সম্মান অভিযাত্রীর বড় প্রেরণা নয়। অভিযাত্রী যিনি তিনি ঘরের মায়া, সমস্ত অর্থ-সম্পত্তির মায়া এবং জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েন অজানার উদ্দেশে। তিনি সব সময় সকল রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়েই চলেন। পরিচিত প্রিয় পরিবেশ, আরাম, বিলাস, সুখ-শান্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এই সমস্ত মিলিয়ে যে জীবন, তা নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এক অতি ভয়াবহ অপরিচিত জগতে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুলতা যাঁর মনে, সম্মান বা টাকা তাঁর বড় প্রেরণা হতে পারে না। তাঁর একমাত্র প্রেরণা যে-শক্তি সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে প্রবল, সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, সেই শক্তির সঙ্গে লড়াই করা। তাঁর একমাত্র প্রেরণা প্রকৃতির কঠিনতম বাধা অতিক্রম করা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শক্তি পরীক্ষা করা। মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করা। প্রকৃতির রহস্য ভেদ ক'রে তা মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করা। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত লোভ, স্বার্থ বা ফাঁকি থাকতেই পারে না, কারণ অভিযাত্রী জানেন জীবিত অবস্থায় তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। সে জন্য অভিযানের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককেই দৈনন্দিন ডায়ারি লিখে যেতে হয়। বাড়ি ফিরে এসে, আহরণ করা তথ্য, যে বেশি দাম দেবে তাকেই বিক্রি করার কোনো অসদুদ্দেশ্য এর মধ্যে স্বভাবতই থাকে না। তিনি জানেন তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কাই পনেরো আনা, তাই তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দু'চোখে কি দেখলেন, দু'হাতে কি আহরণ করলেন, তার বর্ণনা লিখে রাখেন। যদি মৃত্যু হয় তবু কোনো দিন হয়তো কোনো অনুসন্ধানকারী দল সেই ডায়ারিখানা অন্তত খুঁজে পাবে।

অভিযাত্রীর জীবনে এ রকম বহুবার ঘটেছে। অভিযাত্রীর শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তাঁর সংগৃহীত তথ্যে আমরা পেয়ে ধন্য হয়েছি। এ যে কত বড় ঘটনা তা আমাদের বুঝে দেখা উচিত। আমরা ছোট ক্ষেত্রে শক্তির কৌশলকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখতে শিখেছি, তাই এ শক্তির ধারণা আমাদের নেই। ফুটবল খেলোয়াড়ের লক্ষ্য কয়েক গজ দূরেই আবদ্ধ থাকে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য সেই একই লক্ষ্যে বল নিক্ষেপ করার পুনরাবৃত্তি দরকার হয় প্রতিদিন। তারও মূল্য আছে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। কিন্তু সেটা কারো শেষ লক্ষ্য হতে পারে না। এই রকম খেলা নিয়ে অনেক সময় খুব বাড়াবাড়ি হয়, তাতে অনেকের মনে হতে পারে ঐ দুখানা গোলপোস্টের মাঝখানে বল নিক্ষেপ করতে পারাই জাতীয় লক্ষ্য এবং জাতীয় সম্মান। কারণ এরই জন্য খেলার মাঠ অনেক সময় দাঙ্গার মাঠে পরিণত হয়। ছোট জিনিসকে বাড়িয়ে দেখলে তার এই পরিণতি স্বাভাবিক।

দৃষ্টি এই হাতপায়ের কৌশলের ছোট্ট মাঠ থেকে আর একদিকে প্রসারিত করা যাক। ইউরোপের লোকদের মধ্যে খেলাধূলার বাইরের এই বৃহত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করার ইতিহাস অনেক দিনের। আমাদের দেশে জ্ঞান প্রচারের জন্য অভিযান চালানোর ইতিহাস আছে। কিন্তু ভৌগোলিক অভিযানের এই রূপটি সম্পূর্ণ ইউরোপবাসীদের হাতে গড়া। অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করা, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা এবং এই কাজে বার বার পরাজিত হয়েও পরাজয় স্বীকার না করা— এর মধ্যে শুধু বীরত্বই নেই, একটা শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের পরিচয় আছে, মহত্ত্বের পরিচয় আছে। এ একটি সাধনা, যে সাধনা যুগে যুগে বৈজ্ঞানিকেরা ক'রে আসছেন জ্ঞানের পিপাসা মেটাবার জন্য।

ফ্র্যাঙ্কলিনের কথাই ধরা যাক। সঙ্গীদের সহ তিনি যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে এলেন তাইতেই কি তিনি আত্মতৃপ্ত হয়ে কাজ থেকে অবসর নিতে পারলেন? বাকী জীবনটা সম্মানের সঙ্গে সুখে কাটাতে পারলেন?

পারেন নি, কেননা তাঁর নাবিক জীবনে প্রকৃতিকে জয় করার যে প্রেরণার আগুন জ্বলেছিল তা নিবে যাবার নয়। কোনো অভিযাত্রীর মনেই কখনো সেই আগুন নেবে না। তিনি আবার এক অভিযানে যাত্রা করলেন ১৮২৫ সালে। সঙ্গে আবার সেই দুর্দিনের বন্ধুরা—রিচার্ডসন ও ব্যাক। এবারে তাঁরা আগে থাকতে একটু বেশি রকম প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, সেজন্য পূর্বের মতো অতটা দুঃখ ভোগ করতে হয় নি! এবারে দু'বছর ধরে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। কিন্তু তবু মন পড়ে রইল সেই মায়ারাজ্যে। কেননা তখনও যে ভূমি আবিষ্কার ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ অনেক বাকী। সমস্ত জীবন কাজ চালিয়ে গেলেও কি তার শেষ আছে!

এর চৌদ্দ বৎসর পরে এলো এক সুযোগ। ফ্র্যাঙ্কলিন তখন প্রায় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এ কথা অত্যন্ত সত্য—দেহেরই বয়স আছে, মনের নেই। এবারে দেশের তরফ থেকে, আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার একটা সহজ পথ উত্তর-পশ্চিম দিকে পাওয়া যায় কিনা তা দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই উদ্দেশ্যেই একটি অভিযান চলবে। ফ্র্যাঙ্কলিন এই অভিযাত্রী নৌবহরের নেতৃত্ব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। লর্ড হ্যাডিংটনের কাছে দরবার করছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। লর্ড হ্যাডিংটন বললেন, "ভাবছি, সার জন, আপনার বয়স ষাট হয়ে পড়েছে।" ফ্র্যাঙ্কলিন তৎক্ষণাৎ বললেন, "না, না, মাত্র

উনষাট।” কথাটির মধ্যে কৌতুক ছিল, কিন্তু গুরুত্ব ছিল আরও বেশি।

এইখানে বলা আবশ্যক যে, ফ্র্যাঙ্কলিন দ্বিতীয় অভিযানের পরেই নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, সুতরাং তিনি অতঃপর সার জন ফ্র্যাঙ্কলিন রূপেই পরিচিত হন।

দুখানা জাহাজ নাম ‘এরেবাস্’ ও ‘টেরর’ ১৮৪৫ সালের ১৯শে মে তারিখে যাত্রা করল। বিদায় উপলক্ষে সম্মানজনক কামান আওয়াজ করা হল, ফ্র্যাঙ্কলিন সগৌরবে চললেন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে।

জুলাই মাসের প্রথমভাগে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন ডিস্কোর নিকটবর্তী হোয়েল ফিশ দ্বীপপুঞ্জে। তাঁদের খবর বয়ে আনার জন্য একখানা অতিরিক্ত জাহাজ তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল, সেই জাহাজ ফিরে এলো তাঁর শেষ চিঠি বহন করে। তিনি সেই চিঠিতে লিখছেন,—“আমাদের জাহাজগুলো এখন তিন বৎসরের উপযুক্ত সব রকম দরকারী জিনিসে বোঝাই হওয়াতে জাহাজের তলদেশ গভীর জলে প্রবেশ করেছে, কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই—আমাদের জলপথ হয়তো খুব দীর্ঘ হবে না।

অতঃপর ২৬শে জুলাই অভিযাত্রীদলকে ল্যাংকাস্টার সাউণ্ড নামক প্রণালী অভিমুখে যাবার জন্যে অনুকূল অবস্থার অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখা যায়, তারপর তুষারীভূত এলাকায় তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান।

এই যাত্রাই তাঁদের শেষ যাত্রা, তার পর তাঁরা ক্ষুধার্ত তুষার-দৈত্যের কবলে প’ড়ে কি ভাবে মৃত্যু বরণ করেন, বহুদিন পর্যন্ত তা কেউ জানতে পারে নি।

অভিযাত্রীদের কাছ থেকে অনেক দিন কোন খবর পাওয়া না

গেলেও কেউ চিন্তিত হন নি, কারণ অভিযাত্রী সম্পর্কে একমাত্র যে ভয় অর্থাৎ খাদ্যের অভাব, তা তাঁদের ছিল না, সঙ্গে ছিল তিন বছরের খাদ্য-সামগ্রী। সুতরাং যত প্রতিকূল অবস্থাই হোক তাঁরা যে জীবিত থাকবেন এ বিষয়ে সবাই এক রকম নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের একটা বড় নজির ছিল। সার জন রস্ ইতিপূর্বে অভিযানে গিয়ে প্রায় চার বছর বরফে আটকা প'ড়ে ছিলেন, বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না এই সুদীর্ঘ কাল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সার জন রস্ই নৌ-বিভাগে এবং রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে ফ্র্যাঙ্কলিন সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে এক চিঠি দিলেন। তিনি নিজে এতদিন আটকা থেকেও ফিরে আসতে পেরেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি ফ্র্যাঙ্কলিন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ফ্র্যাঙ্কলিনের জাহাজগুলো মেলভিল দ্বীপের পশ্চিম সীমান্তের দিকে বরফে আটকা পড়েছে এবং তাঁর ফেরবার পথে এত বরফ জমছে যে কোনো দিনই আর তিনি ফিরে আসতে পারবেন না।

একটা শীত কাটল, দ্বিতীয় আরও একটা শীত কাটল, তবু সবাই ভাবলেন এখনও চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু তবু সবাই মেরু-অভিযাত্রী নৌবিভাগের অভিজ্ঞ লোকদের মতামত সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁরা সবাই বললেন, তাঁরা খারাপটাই আশঙ্কা করছেন। তদনুসারে তাঁর অনুসন্ধান কাজ শুরু হল। বছরের পর বছর কেটে গেল, পুরো দশটি বছর ধ'রে চলল সেই অনুসন্ধানের কাজ। সমস্ত জগৎ ফ্র্যাঙ্কলিনের খবরের জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে ১৮৫৪ সালে পাওয়া গেল খবর। ডাক্তার জন্ রে নামক হাড্‌সন্স বে কম্পানির এক তথ্যানুসন্ধানী জানালেন, তিনি কয়েকজন এস্কিমোর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, তারা নাকি প্রায় ছ বছর আগে একদল শ্বেতকায় লোককে বরফের উপর দিয়ে নৌকো ও স্লেজ ঠেলে নিয়ে যেতে দেখেছে। কিছুদিন পরে তারা ঐ দলের অনেকেরই খবর পেয়েছে ও নৌকো পড়ে থাকতে দেখেছে। বরফের ধাক্কায় তাঁদের জাহাজগুলো ভেঙে যাওয়াতেই তাঁরা কোনো খবর পাঠাতে পারেন নি, এই কথা নাকি তাঁরা আকারে ইঙ্গিতে (ওদের ভাষা না জানায়) এস্কিমোদের কাছে তখন বলেছিলেন। তারা তাদের কথার প্রমাণস্বরূপ ফ্র্যাঙ্কলিনের জাহাজে ব্যবহৃত রূপোর চামচে ও কাঁটা ডাক্তার রেকে দেখায় এবং ডাক্তার রে সেগুলো তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। এস্কিমোদের এই খবর সত্য মেনে নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ডাক্তার রে ও তাঁর দলকে দেড় লাখ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হল।

ফ্র্যাঙ্কলিন আর বেঁচে নেই, এর বেশি আর কি জানবার থাকতে পারে, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের স্ত্রী তখনও এ খবরে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সরকারকে চাপ দিয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি দলকে সেখানে পাঠাইবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সরকারপক্ষ উৎসাহ দেখালেন না। নতুন একটি দলকে পাঠানো অসুবিধাও ছিল। কিন্তু লেডি ফ্র্যাঙ্কলিন ছাড়লেন না, তিনি নিজের খরচে একটি দল পাঠালেন।

বহুদিন পরে যে তথ্য সংগ্রহ করা হল তা যেমন ভয়াবহ তেমনি মর্মস্পর্শী।—সেই একই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর আবহাওয়ায় তিলে তিলে মৃত্যুর মর্মভেদী কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। দীর্ঘ শীতের আলোহীন হ্রস্বদিনে, বিক্ষুব্ধ তুষার-ঝড়ের সুদীর্ঘ রাত্রে, বরফের বন্দীশালায়, পরিচিত

জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, সঙ্গীদের আগেই বীর ফ্র্যাঙ্কলিন মৃত্যু বরণ করেছিলেন। দিনরাত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে, পরিত্রাণের একটুখানি পথ খুঁজে বের করতে কি ধৈর্য, কি সহিষ্ণুতাই যে তিনি দেখিয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তাঁর বীর সঙ্গীরা? তাঁদের কাহিনীও কম স্মরণীয় নয়। অথচ কি আশা নিয়েই তাঁরা গিয়েছিলেন এবারে! কি উৎসাহ! যার জন্য ষাট বছরের প্রায়বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর বৃদ্ধত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

প্রথম শীত তাঁদের কেটেছিল বীচী দ্বীপে, এবং মনে হয় আরামেই কেটেছিল, কারণ এর পর তাঁদের যে বিপদে পড়তে হবে তা তখন তাঁদের কল্পনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না।

১৮৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্র্যাঙ্কলিন দুখানা জাহাজকে ক্রমাগত ভাসমান বরফ স্তূপের ধাক্কা সত্ত্বেও এগিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা বেশি দূর যেতে পারলেন না। সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই হঠাৎ শীত এসে গেল এবং তার ফলে 'এরেবাস্' ও 'টেরর' আবার জমাসমুদ্রের লৌহকঠিন মুঠোর মধ্যে আটকা পড়ে গেল। জায়গাটা কিং উইলিয়াম ল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তে। দুধারের বরফের ধাক্কায় জাহাজগুলো একবার সামনে এগোচ্ছে, একবার পিছনে হটছে, কিন্তু কোথাও যেতে পারছে না। প্রতি মুহূর্তে এক একটি প্রচণ্ড ধাক্কায় মনে হচ্ছে যেন জাহাজ দুখানা গুঁড়ো হয়ে যাবে!

১৮৪৭ সালের বসন্তকালে 'এরেবাস্'-এর চালক লেফটেন্যাণ্ট গ্রাহাম গোর একজন অফিসার ও ছজন সঙ্গী সহ কিং উইলিয়ামস ল্যাণ্ডে প্রেরিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে স্লেজ গাড়িও রইল। তিনি পয়েন্ট ভিক্টোরিতে পৌঁছে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি রেখে এলেন।—

"২৮-৫-১৮৪৭, এরেবাস্ ও টেরর ৭০°৫′ দ্রাঘিমা ও ৯৮°২৩′ অক্ষ-রেখায় অবস্থিত জায়গায় শীত কাটাচ্ছে। ইতিপূর্বে পেজ দ্বীপে আরও দুটি শীত কাটিয়েছে……সার জন ফ্র্যাঙ্কলিন নেতৃত্ব করছেন। সব কুশল।—

আরও এক বছর পরে ঐ বিবরণের সঙ্গে আরও একটু দুঃখের কাহিনী যোগ করা হল। তারপর ১৮৪৮এর ২৫শে এপ্রিল তারিখে পাথরের চাপার নিচে থেকে ঐ বিবরণ বের ক'রে নিয়ে তাতে লেখা হল, "গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ থেকে এরেবাস্ ও টেরর সম্পূর্ণ বরফ-বেষ্টিত হওয়ায় ১৮৪৭-এর ২২শে এপ্রিল তারিখে জাহাজ পরিত্যাগ করা হল। অফিসার ও নাবিক সহ ১০৫ জন লোক, ক্যাপটেন ক্রোজিয়ারের নেতৃত্বে দ্রাঃ ৬৯° ৩৭′ ৪২″ উত্তর, অঃ রেঃ ৯৮°৪১′ পশ্চিম, এই স্থানে অবতরণ করলেন। সার জন ফ্র্যাঙ্কলিন ১১ই জুন ১৮৪৭ তারিখে মারা গেছেন। আজ পর্যন্ত মোট ৯ জন নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। ……কাল ব্যাক্স্ ফিশ নদীর দিকে রওনা হচ্ছি।"

পূর্ব বিবরণের মার্জিনে এই কথাগুলো যোগ ক'রে দুই জাহাজের দুই পরিচালক তাতে স্বাক্ষর করলেন এবং পূর্বস্থানে পাথর চাপা দিয়ে রাখলেন।

যে তারিখে "সব কুশল" লেখা হয়েছিল, মনে হয় সে তারিখ পর্যন্ত ভবিষ্যতে কি হবে তা তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি। মনে হয় ফ্র্যাঙ্কলিনের মৃত্যুর পরেও তাঁরা সাফল্যের আশা করছিলেন। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মেরুগ্রীষ্ম এসেই চলে গেল, জাহাজ যেমন আটকা প'ড়ে ছিল তেমনই রইল। তারপর আবার এলো শীতের বিভীষিকা, মুক্তির আশা হল সুদূরপরাহত। তার পর ১৮৪৮ সাল এলো। ক্যাপটেন

ক্রোজিয়ার সিদ্ধান্ত করলেন, জাহাজের আশা না ছাড়লে মুক্তির আশা নেই।

সেই অনুযায়ী ২৫শে এপ্রিল তারিখে ১০৫ জন ভাগ্যতাড়িত লোক মূল ভূখণ্ডে যাবার জন্য নৌকো, স্লেজ ইত্যাদি নিয়ে রওনা হলেন। যেতে হবে গ্রেটফিশ নদীর পথে, জাহাজ থেকে তার মোহনা ২৫০ মাইল দূরে। সে পথ এমনই ভয়ঙ্কর যে মুক্তির অন্য কোনো পথ থাকলে সে পথে তাঁরা কখনো যেতেন না।

এই ঘোর বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করার ফল কি হয়েছিল তা পরে জানতে পারা গেছে এস্কিমোদের কাছ থেকে। ডাক্তার রের কাছে তারা বলেছে, সেই হতভাগ্য অভিযাত্রীদলের কাছে তারা নাকি সীল-মাংস বিক্রি করেছিল, সুতরাং তাদের কাহিনী মিথ্যা নয়। তাদের কাছ থেকে জানা যায়, ঐ ইংরেজ যাত্রীরা যখন দড়ি ধ'রে উঁচুদিকে উঠছিলেন, তখন দড়ি ফস্কে পড়ে গিয়ে অনেকে মারা যান। মাত্র ৪০ জন আন্দাজ লোক তখনও বেঁচে ছিলেন, তাঁরা গ্রেটফিশ নদীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিলেন মৃত্যুর সঙ্গে প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে। কিন্তু সে কাহিনী বলবার মতো একজনও তার পর আর বাঁচতে পারেননি। তাঁরা অনাহারে শীর্ণ হয়ে একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত যিনি বেঁচে ছিলেন, তিনি চার দিকে বন্ধুদের মৃতদেহের সেই ভয়াবহ সীমাহীন শ্মশানে বসে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে, কি ভেবেছিলেন তা আর কারো জানবার উপায় নেই।

কিন্তু পৃথিবী জানে তাঁদের এই মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি এবং সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে।

ফ্র্যাঙ্কলিনের দলবলসহ নিরুদ্দেশের কাহিনীর কথা সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়ল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সংবাদে দুঃসাহসী বীরেরা যাঁদের এ রকম বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তাঁরা ফ্র্যাঙ্কলিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে ওদেশের পার্থক্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের রীতি হচ্ছে, একবার যে পথে বিপদ সে পথে যাওয়া নিষেধ। শত রকম সংস্কার এবং বিধিনিষেধ, তিথি নক্ষত্র থেকে শুরু ক'রে হাঁচি, টিকটিকি সবাই আমাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে আমরা ভয়ে মরি, কি জানি হাঁচির মানে কি, কি জানি টিকটিকি কি বলতে চায়। এ ধরনের সংস্কার অল্পবিস্তর হয় তো সব দেশেই আছে, কিন্তু যার ফলাফল বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণসিদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ মনগড়া, তা একমাত্র আমাদের দেশেই অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে মানা হয়। এর ফলে চারদিকে অদৃশ্য শত্রুর শত শত অদৃশ্য বাধা কল্পনা ক'রে কোনো রকমে প্রাণটা নিয়ে বেঁচে থাকাই আমরা সব চেয়ে বড় কাজ মনে করি। কিন্তু যারা ভীরু নয়, তারা বলে বিপদ থাক না, আমরা বিপদকে জয় করব। কারণ ভয় পেলেই ভয় আমাদের মারতে আসে, ভয় না পেলে বিপদ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, তা ছাড়া সাহসের সঙ্গে বাধাকে জয় করার একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে, ভীরু সে আনন্দের স্বাদই জানে না!

ফ্র্যাঙ্কলিনের নিখোঁজ হওয়া উপলক্ষে অনেক অভিযানের আয়োজন হয়েছিল, এবং সেজন্য ফ্র্যাঙ্কলিনের হাতে যে কাজ অসমাপ্ত ছিল, তা সমাপ্ত হতে পারল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকার উত্তর দিক দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার কোনো সোজা রাস্তা পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করা। ফ্র্যাঙ্কলিনকে খুঁজতে

গিয়ে পরে সেই পথ আবিষ্কার হয়েছিল। সেজন্য অনেকে বলেন, ফ্র্যাঙ্কলিন বেঁচে থাকতে মেরু প্রদেশ সম্পর্কে আমরা যে সব কথা জানতে পারিনি, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে সে সব কথা জানবার সুযোগ আমাদের বেশি হয়েছে। নিরুদ্দিষ্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্য যে সব সন্ধানী অভিযাত্রী দল গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি দলের দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনী শোনবার মতো। সাহস, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, মনের বল, উপস্থিতবুদ্ধি, মহানুভবতা, নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এতে দেখা গেছে, তার তুলনা হয় না।

এই দলের নেতৃত্ব করেছিলেন আমেরিকাবাসী ডাক্তার এলিশা কেণ্ট কেন্। অভিযানের ইতিহাসে এত বড় ভয়াবহ দুঃখভোগের কাহিনী আর নেই বললেই চলে। সুদীর্ঘ একুশ মাস ধ'রে এই সন্ধানী দলের জাহাজখানা মৃত্যুর দুপাটি দাঁতের কামড়ে আবদ্ধ অবস্থায় ছিল। খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, নাবিকেরা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, বার বার মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছিল, মাসের পর মাস অনাহারের বিভীষিকা চোখের উপর ভাসছিল, আর মনে হচ্ছিল এই দুর্ভোগের ভীমজাল ছিঁড়ে এ জীবনে আর বেরিয়ে আসা চলবে না। কিন্তু ভাগ্যের এই নির্মমতম পরিহাসের অবর্ণনীয় দুর্বিপাকের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার কেন্ প্রকৃত বীরের ন্যায় আশার বিরুদ্ধে আশা নিয়ে মাথা সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সঙ্গীদলের প্রত্যেকটি লোক যখন মৃত্যু নিশ্চিত জেনে নিরাশায় ভেঙে পড়েছে, তিনি তখনও আশা করছেন বাঁচতে হবে। এই আশার জোরেই তিনি তাঁর কঙ্কালসার জীবিত সঙ্গীদের ১৩০০ মাইল ব্যাপী জল বরফ আর দুর্যোগের দীর্ঘ পথ পার করিয়ে সভ্যজগতের সীমানায় এনে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। একমাত্র

বাহন জাহাজখানা অকর্মণ্য হয়ে পড়ায় সেখানাকে ফেলে আসতে হয়েছিল ১৩০০ মাইল দূরের সেই যমের দুয়ারে।

প্রথম যাত্রা করেছিলেন তাঁরা ১৮৫৩ সনের ৩০শে মে তারিখে নিউ ইয়র্ক থেকে। জাহাজের নাম অ্যাড্ভান্স। ডাক্তার কেন্এর ডায়ারিতে এই অভিযানের সকল খবরই চমৎকার লেখা আছে।

এই ডায়ারি থেকে জানা যায়, তাঁর যাত্রার দুইমাস পরে তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলভাগে পেঁাছে প্রথম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ এইখানে বরফের মধ্যে দিয়ে জাহাজ চালাতে হচ্ছে। ছোট বড় এক একটা ভাসমান বরফের পাহাড় সর্বত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলো স্রোতের বেগে বেগবান। এই হিমশৈল বা আইসবার্গগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওদের বেশির ভাগ অংশ থাকে জলের নিচে, উপরে ভেসে থাকে সামান্য অংশ। এই সামান্য অংশই এক একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতো, সুতরাং জলের নিচের অদৃশ্য অংশ যে কি ভয়ানক প্রতারণাকারী তা সহজেই বোঝা যাবে। এই রকম একটি হিমশৈলে অ্যাড্ভান্স গেল আটকে—চড়ায় যেমন স্টীমার আটকে যায়। সেটা থেকে জাহাজ ছাড়াতে না ছাড়াতে সেই হিমশৈলের সম্মুখভাগটি কামানের গর্জনের মতো সশব্দে ভেঙে পড়ল জলে। ডাক্তার কেন্ বুঝতে পারলেন সঙ্কট শুরু হল এইবার।

মেলভিল উপসাগরের পথে যেতে আর কোনো বিপদ হয়নি, কিন্তু আরও উত্তর দিকে জাহাজ ইতিমধ্যেই ভাসমান ছোট ছোট বরফখণ্ড বা আইস-ফ্লোর সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছিল, এইবার দেখা দিতে লাগল হিমশৈলের প্রকাণ্ড এক একটি দল। তাদের এড়াবার কোনো উপায় ছিল না। ঝড়ের মতো হাওয়া, প্রচণ্ড তার বেগ, সেই হাওয়ায়

হিমশৈলগুলো গতিবান। জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে সেইখানেই সলিল-সমাধি।

কিন্তু আরও এগিয়ে যাবার পর দেখা গেল, ছোট ছোট বরফ-টুকরোয় আচ্ছন্ন জলের একটা দিকে হিমশৈলগুলোর সম্মুখের জল খানিকটা জায়গা পর্যন্ত বরফমুক্ত আছে। ঝড় জাহাজখানাকে সেই দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল জাহাজের গতি পরিবর্তিত হয়েছে, আর হিমশৈল দ্রুততর বেগে জাহাজের দিকে ছুটছে। আর রক্ষা নেই। দুই বরফ-পাহাড়ের মাঝখানে প'ড়ে জাহাজ নিশ্চিত-রূপে চূর্ণ হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল।

জাহাজের গতি আগেই ফিরেছিল, কিন্তু সেই হিমশৈলগুলো প্রকাণ্ড এক একটা টর্পীডোর মতো জাহাজের পিছন দিকে ছুটে আসতে লাগল। আর তো বাঁচবার কোনো উপায়ই নেই, এমন সময় দেখা গেল, এক হিমশৈলের একটা টুকরো অংশ আরও বেশি বেগে ছুটে চলেছে জাহাজের পাশ দিয়ে। ডাক্তার কেন্-এর মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ঐ বরফের টুকরোকে আসতে দেখেই তাড়াতাড়ি জাহাজের নোঙর তার উপর নিক্ষেপ করলেন এবং টানা দড়ির সাহায্যে সেটিকে বেঁধে দিলেন জাহাজের সঙ্গে। তাতে আশ্চর্য ফল ফলল। সেই শ্বেত অশ্ব জাহাজকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল মেলভিল উপসাগরের দিকে।

পিছনে চেয়ে দেখা গেল, হিমশৈলগুলোও ছুটে আসছে জাহাজকে অনুসরণ ক'রে। ক্রুদ্ধ হিম-দেবতার নিক্ষিপ্ত টর্পীডো সেগুলো, জাহাজ যদি কোথায়ও বাধা পেয়ে থেমে যায় তা'লে তাকে অতল জলে

তলিয়ে দেবে। এদিকে জাহাজ যে বরফমুক্ত সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে ছুটে চলছিল তার সঙ্কীর্ণতা আরও বেড়ে যাচ্ছে, মুক্ত জলপথটুকুর দুধারে বরফের প্রাচীর! এক জায়গায় পথ ৪০ ফুটেরও কম প্রশস্ত। সেখানে সবাই কাঠের সাহায্যে সেই প্রাচীরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জাহাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে লাগলেন। জাহাজ নিরাপদে বেরিয়ে গেল নিতান্তই ভাগ্যবশতঃ। মৃত্যুর মুখে প'ড়ে এই উপস্থিত-বুদ্ধিটির অভাব ঘটলে সব শেষ হয়ে যেতে আর কতক্ষণ লাগত?

জাহাজ যখন দ্রাঘিমা ৭৮° ৪৩' উত্তর স্থানে পৌঁছল তখন শীত শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং আবার বরফের লৌহবেষ্টনী। আর চলবার উপায় নেই, দীর্ঘ শীত কাটাতে হবে সেখানে। সেই জনহীন দেশ, যেখানে চারদিকে সাদা আর সাদা। যেখানে শীতের প্রচণ্ড ঝড় বয় দিন-রাত। যেখানে নিঃসঙ্গ হিম-দেবতার হিম নিশ্বাসে সমস্ত মরুভূমিতে পরিণত হয়। যেখানে দীর্ঘ রাত্রির নিষ্ঠুর বিস্তার সেই শ্বেত মরুভূমিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে! সেখানে রাত্রি আসে, অথচ ঘুমোবার কেউ নেই।

ডাক্তার কেন্-এর দল সেই মায়াহীন হিম-কারার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করতে চলেছেন সেখানে। প্রথম থেকেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—একটার পর একটা। স্লেজটানা কুকুরগুলো বরফের ফাটলে পা পিছলে প'ড়ে গেল জলে, স্লেজ-এর দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল তাঁরাও মারাত্মক বিপদে পড়লেন, তাঁদের উদ্ধার করা হ'ল অনেক চেষ্টার পর; নাবিক ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাধি ও মৃত্যু আরম্ভ হয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নের বোঝা ক্রমেই শক্ত হয়ে চাপতে লাগল ডাক্তার কেন্-এর বুকে।

কি শোচনীয় অবস্থা সে! দলের প্রায় প্রত্যেকে অসুস্থ হয়ে

বিছানায় পড়ে ছটফট করছেন। কারো হাত জমে গেছে, কারো পা জমে গেছে। সে কি ভয়ানক হিমাক্রমণ। যেখানে আক্রমণ হয় সেখানটা প্রথম অসাড় হয়ে যায়, তার পর পচে ওঠে, হাতে পায়ের নখ খুলে আসে আঙুল থেকে। এই অবস্থায় তাঁদের কারো হাত বা পা কেটে ফেলা হচ্ছে অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে, কারো ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে। ডাক্তার কেন্ এই ভয়াবহ পরিবেশে এক এক সময় দিশাহারা হয়ে পড়ছেন।

এইভাবে কাটল শীতকাল, তার পর স্বল্প বিরাম। অবস্থা সাময়িক-ভাবে বিছানা ছেড়ে বাইরে আসার উপযুক্ত হ'ল, এইবার মেরুপ্রদেশের তথ্য সংগ্রহ করা চলবে অল্প কয়েক দিন ধ'রে, কিন্তু জাহাজে রুগ্ন শয্যা-শায়ী লোকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। উপায় নেই, ডাক্তার কেন্ তবু বেরোবেন অনুসন্ধানের কাজে। আয়োজন চলতে লাগল।

জাহাজ থেকে স্লেজসহ একটি ছোট দল যাত্রা করল। তার পর কি হ'ল তা ডাক্তার কেন্-এর ডায়ারিতে পাওয়া যাবে। তিনি ২০শে মে তারিখে চারদিকে বালিশের আশ্রয়ে শুয়ে রুগ্ন বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অসুস্থ অবস্থায় লিখছেন—"উত্তরে যাবার পথ আবিষ্কারে আমি আবার ব্যর্থ হলাম।" তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে স্কার্ভি দেখা দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্কার্ভি রোগের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক, তা'হলে কি ভয়ানক ব্যাধি এটি তার কিছু ধারণা হবে। লক্ষণগুলো ইউনিভার্সাল হোম ডক্টর নামক বই থেকে উদ্ধৃত করছি।—

"স্কার্ভি হয় খাদ্যের ত্রুটিতে—ভাইটামিন 'সি'র অভাবে। নাবিকদের মধ্যে দেখা যায় যারা কেবল লবণাক্ত মাংস খায়, টাটকা শাকসব্জী খায় না, তাদের এই অসুখ হয়। আগে এর প্রতিকার জানা ছিল না; এখন জানতে পারা গেছে, তাই খাদ্যের সঙ্গে টাটকা ফল ব্যবহার করা হয়।

বয়স্কদের মধ্যে এ অসুখ কম হয়। যে সব শিশু টিনে রক্ষিত দুধ বা কেবলমাত্র ফোটানো দুধ খায়, কিংবা পেটেণ্ট খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তাদের বেশি হয়। বয়স্কদের মধ্যে যারা ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেলে, ওজন যাদের কমতে থাকে, তাদের খাদ্যের সঙ্গে টাটকা ফল ও শাকসব্জী না থাকলে স্কার্ভি দেখা দেয়। স্কার্ভি হলে মুখ বিবর্ণ হয়, দাঁতের মাড়ি শিথিল হয়ে যায় এবং সহজে রক্ত পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে দাঁতও ঢিলে হয়ে প'ড়ে যায়। অনেক সময় নাক থেকে রক্ত পড়তে থাকে এবং প্রস্রাব ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে। চামড়ার উপর এক এক জায়গায় রক্ত-চিহ্ন দেখা যায় এবং সামান্য আঘাতে চামড়ার নিচে রক্তপাত হয়। রোগী অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং পেটের অসুখে ভোগে।"

জাহাজের লোকদের মধ্যে শুধু স্কার্ভি নয় আরও বহু রকম অসুখ হয়েছে। অনেকেই তুষার-অন্ধতায় ভুগছেন। চারদিকে উজ্জ্বল আলোয় ক্রমাগত সাদা দেখতে দেখতে চোখ সাময়িক ভাবে অন্ধ হয়ে যায়—কোনো বর্ণই আর দেখতে পারে না। চোখে প্রদাহ জন্মে।

জাহাজের অন্য লোকদের এই অবস্থা, তদুপরি ডাক্তার কেন্ স্বয়ং অচৈতন্য এবং বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। জাহাজের পাঁচজন অসুস্থ বন্ধু তাঁদের নিজেদের অসুখ অগ্রাহ্য ক'রে ডাক্তার কেন্-এর সেবায় নিযুক্ত না থাকলে তাঁর বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। এর উপর ঘন তুষারপাত, সুতরাং কোথায়ও যাওয়ার কল্পনা করা কঠিন। তাই স্লেজ-সমেত অনুসন্ধানকারী দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে জাহাজের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এত আগেই ফিরে আসতে হবে তা তাঁরা ভাবতে পারেন নি।

ডাক্তার কেন্-এর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি সহজে

হাল ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন না। তাই তিনি একটু সুস্থ হয়ে যখনই বুঝতে পারলেন, এভাবে প'ড়ে থাকলে চলবে না, তখনই নতুন উদ্যমে নতুন পরিকল্পনা করতে লাগলেন। তাঁদের সঞ্চিত ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছিল, এবং সেটাই ছিল একমাত্র ভাববার বিষয়। সপ্তাহ-খানেক আগে অসীম কর্তব্যনিষ্ঠ পিয়ের মারা গেছেন, তাতেও অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন জীবিত এবং সক্ষমদের মধ্যে মাত্র তিনজন লোক আছেন যাঁদের উপর কর্তব্য চাপানো যেতে পারে। অফিসারদের মধ্যে উইলসন, ব্রুক্‌স্, সনট্যাগ এবং পিটার্সন শয্যাশায়ী। অথচ সনট্যাগ, ডাক্তার হেস্ ও ডাক্তার কেন্ ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা জরিপের কাজ চালানো সম্ভব নয়। এই তিন জনের মধ্যে আবার ডাক্তার হেস্‌ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এখনও খাড়া আছেন।

তাঁদের এখনও যে অংশটিতে তথ্যানুসন্ধানের কাজ বাকী ছিল, সেটি উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু এই কাজে এখন সম্পূর্ণ কুকুরের শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ নিজেদের চলার ক্ষমতা আর অবশিষ্ট নেই। তদনুযায়ী ডাক্তার কেন্ কুকুরে টানা স্লেজে হেস্‌কে তথ্যানু-সন্ধানের কাজে পাঠালেন। কিন্তু হেস্ তাঁর কাজে অনেকখানি সফল হলেও তখনও একটি জরুরি তথ্য অনুসন্ধান বাকী রইল। সুতরাং এবারে দুটি দল পাঠানো হ'ল। তাঁরা কাজ শেষ ক'রে ফিরে এলেন, কিন্তু ডাক্তার কেন্ যে একটি বিশেষ প্রণালী-পথ আছে ব'লে অনুমান করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁরা সঠিক খবর তখনও আনতে পারলেন না।

এই কাজে ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে এলো, কিন্তু তবু কোথাও বরফ না গলাতে, ডাক্তার কেন্-এর অনুমান সত্য কিনা তা নিশ্চিত-ভাবে জানা সম্ভব হ'ল না। এখন উপায় কি? যদি পুনরায় এ

কাজে নিযুক্ত হওয়া যায় তা'হলে মাঝপথে সে অভিযান ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা শীত অতি প্রবল ভাবে এসে পড়বে, এবং শীতের বিরুদ্ধে চলা এখন তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। সবাই দুর্বল, খাদ্য ফুরিয়ে এসেছে, আগুন জ্বালাবারও কোনো উপকরণ নেই। ডাক্তার কেন্ যাঁর সঙ্গেই পরামর্শ করেন তিনিই নিরুৎসাহিত হয়ে ওঠেন, ডাক্তার হেস্‌ও ভবিষ্যতের কল্পনায় দমে গেছেন। আর ডাক্তার কেন্ নিজে? তিনি যখন জাহাজভরা রুগ্ন এবং মুমূর্ষুদের কথা স্মরণ করেন, তখন তাঁর মনেও কোনো উৎসাহ জাগে না।

তিনি ভাবলেন এত শীগগিরই যদি জাহাজ ছাড়তে হয় তা হ'লে সে তো হবে হার স্বীকারের সমান। এ কল্পনাটাই তাঁর নিজের কাছে খুব অপমানকর মনে হ'তে লাগল। অবশ্য সব দিক ভেবে দেখলে জাহাজ ফেলে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোনো উপায় তখন আর মাথায় আসে না। আবার সঙ্গীদের কথা ভাবলে জাহাজ পরিত্যাগ করা অসম্ভব মনে হয়।

সে জন্য তিনি এ দায়িত্ব নেবেন না বলেই স্থির করলেন।

তাঁর মনে শুধু একটি সমস্যা জেগে রইল—এখন তবে কর্তব্য কি। কয়েক জন সঙ্গীর পা অস্ত্রপ্রয়োগে সদ্য কাটা পড়েছে, অন্যেরাও অসুস্থ, তাঁরা পথ চলবেন কেমন ক'রে?

এখান থেকে রওনা হ'লে প্রথম আশ্রয় মিলবে গিয়ে ইউপারনাভিক অথবা বীচী দ্বীপে। তার দূরত্ব কম নয়। পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। সুস্থ লোকের পক্ষেই এতটা পথ চলা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডাক্তার কেন্ আপন মনেই যুক্তি ক'রে চলেছেন।

তিনি এখনও ভাবছেন, জাহাজকে এই বরফের কয়েদখানা থেকে

হয় তো উদ্ধার করা যেতেও পারে। এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং শেষ বারের মতো তিনি মন স্থির ক'রে ফেললেন—তিনি যাবেন না। বন্ধুদের অসহায় অবস্থায় ফেলে যাবেন না।

কেন্ এক দিন একা বেরিয়ে গেলেন বরফের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য। মনে হল যেন অবস্থা খুব খারাপ নয়। ভাবলেন একাই রওনা হয়ে বীচী দ্বীপ থেকে সাহায্য আনতে পারলে মন্দ হয় না। এ কাজ আদৌ সহজ নয় তা তিনি জানতেন, কিন্তু এটি তাঁর কর্তব্য। অধীন লোকদের ঘাড়ে এ কাজের ভার তিনি অবশ্যই চাপাতে পারতেন, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর কাজটি তিনি করলেন না। তিনি ভাবলেন পথের বিপদের কথা ভেবে সেই বিপদের মুখে আর একজনকে ঠেলে দেওয়ার কোনো অধিকার তাঁর নেই। তাছাড়া ল্যাঙ্কাস্টার প্রণালী ও স্থানীয় বরফের গতিবিধি সম্পর্কে একমাত্র তাঁরই অভিজ্ঞতা আছে, ওদের নেই।

কেন্ পাঁচজন অনুচর সঙ্গে নিলেন। স্লেজে চাপিয়ে নিলেন 'পরিত্যক্ত আশা' নামক একখানি নৌকো। জল পর্যন্ত পৌঁছলে তখন এই নৌকো কাজে লাগবে। দক্ষিণের দিকে রওনা হলেন তাঁরা। তারপর বিপদের পর বিপদ পার হয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন এগিয়ে।

ডাক্তার কেন্ তাঁর ডায়ারিতে লিখছেন—"অবশেষে ৩১শে জানুয়ারি প্যারি অন্তরীপ থেকে দশ মাইল দূরে এসে আমাদের একেবারে থেমে যেতে হল। নিরেট বরফের পাহাড় আমাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত সেই নিষেধের পাহাড়। পশ্চিমে চেয়ে দেখি ভাসমান হিমশৈল একটার পর একটা। ছোট ছোট

আইস্ ফ্লো বা হিমপুঞ্জে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জলের উপরিভাগ। জলের স্রোতের সঙ্গে তারা ভেসে চলেছে। তারই একটার উপরে ম্যাগারি ও আমি বহু কষ্টে উঠে তা থেকে আর একটার উপরে গেলাম। এই ভাবে একটা থেকে আর একটার উপর চ'ড়ে চার মাইল পথ এগিয়ে গেলাম এক হিমশৈলের দিকে। সে এক প্রকাণ্ড ভাসমান বরফের পাহাড়, আইসবার্গ। এতক্ষণ এসেছি অনেক ছোট ছোট টুকরো বরফের উপর দিয়ে।

সেই প্রকাণ্ড হিমশৈলের উপরে গিয়ে উঠলাম। সেটি ১২০ ফুট উঁচু। সেইখানে উঠে দূরবীণের সাহায্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যতদূর দেখা যায় দেখলাম।

দেখলাম সেখান থেকে ৩০ মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে নিরেট স্থির এবং দুর্গম সমুদ্র। সেখানে যাওয়া মানুষের অসাধ্য। অতএব নিরাশ হ'তে হ'ল। বোঝা গেল বরফের বাধা কিছু পরিমাণ দূর না হ'লে আরো এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; অতএব আবার সেই কঠিন পথে ফিরে এসে বরফের সেই কঠিন কয়েদখানায় আরও একটি ভয়াবহ শীত কাটানো ভিন্ন আর কোনো উপায়ই রইল না। কিন্তু সেই আর একটি শীত মানে অনেক কিছু। মানে আবার মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিদিন প্রাণপণ লড়াই। খাদ্য নেই, আগুন জ্বালবার কিছু নেই, আছে শুধু ব্যাধি আর অন্ধকার!

আরও কয়েক দিন কাটল। ক্রমেই বোঝা গেল জাহাজ ফেলে যাওয়া ভিন্ন গতি নেই। এ ভিন্ন আর কিছু চিন্তা করা তখন অসম্ভব। ডাক্তার কেন্ সবাইকে একত্র ক'রে সব কথা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন তাদের। কেন তিনি এত দিন জাহাজ ছাড়তে চাননি, সে কথা তাদের

কাছে খোলাখুলি ভাবেই বললেন। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন খোলা সমুদ্রে (বরফে আটকানো নয় যেখানে জাহাজ চলে) পৌঁছনোর চেষ্টা করলে সে চেষ্টা কখনো সফল হবে না। তাছাড়া তাতে বিপদ এত বেশি যে শুধু সেই জন্যই সে চেষ্টা করা চলে না, কিন্তু তবু যাঁরা এ দায়িত্ব নিতে চান, তাঁদের তিনি অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছেন।

জাহাজে তখন জীবিতের সংখ্যা মোট সতেরো জন। তাঁদের মধ্যে আটজন বললেন তাঁরা জাহাজ ছেড়ে যাবেন না।

তখন জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাগ ক'রে বিদায়ী অভিযাত্রীরা তাঁদের অংশসহ ২৮শে অগস্ট তারিখে রওনা হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

কয়েক মাস কেটে গেছে এর মধ্যে।

যাঁরা পথ একটা খুঁজে পাবেনই এই আশায় রওনা হয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা সে কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে এলেন সেই জাহাজেই।

এঁরা চলে যাওয়াতে জাহাজে যাঁরা প'ড়ে ছিলেন, তাঁদের মনের উপর একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তাঁদের মনে হয়েছিল যারা গেল বেঁচে গেল, আর যারা জাহাজে রইল, তারা রইল শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। এই সব চিন্তাতেই কয়েকটা মাস কেটেছিল। এঁরা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে আসাতে সমস্যা আরও বাড়ল। রসদ যা ছিল তা আগেই ভাগ করা হয়েছিল। যাঁরা চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অংশ নিয়ে তাঁরা তো খালি হাতে ফিরে এলেন। এর পর কি হবে?

ক্রম-নিঃসঙ্গতা। ক্রমে এঁদের সংখ্যা কমে আসতে লাগল।

প্রচণ্ড শীত। খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, চলবার ক্ষমতা নেই, তিলে তিলে মৃত্যু। অনিবার্য মৃত্যু।* বাঁচবার কোনো উপায় নেই। অথচ ঠিক এই সময়ে যে-কোনো উপায়ে হোক, একটুখানি আশা, সমস্ত দুঃখের পারে পরিচিত জগতে ফিরে যাবার একটুখানি আশা, তাঁদের মনে জিইয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি ছিল।

এতদিন সার্ জন ফ্র্যাঙ্কলিন আর তাঁর সঙ্গীদের দুর্ভাগ্য নিয়ে এঁদের মধ্যে কত আলোচনা হয়েছে, আর আজ এঁদের আলোচনার বিষয় এঁদের নিজেদের দুর্ভাগ্য। কি ক'রে এর হাত থেকে বাঁচা যায় তার অসম্ভব সব পরিকল্পনা।

সমস্যার সমাধান হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবু কিছু অন্তত করতেই হবে। চুপ ক'রে থাকা অসম্ভব। বেঁচে থাকতে হবে, যেমন ক'রে হোক। তাই তাঁরা একদিন সীল শিকারের আয়োজন করলেন। এক দিন শিকার খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এক অদ্ভুত তুষার-বলয়ের উপর এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ভয়নাক বিপজ্জনক সে জায়গাটি। ফেলে আসা নিরেট বরফের পথ সেখান থেকে অন্তত এক মাইল দূরে। সেখানে ফিরে যাওয়া অসাধ্য হয়ে উঠল। কুকুরগুলোর পায়ের নিচের বরফ সব চাপ লেগে লেগে পাক খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে। জলের উপর জমাট বাঁধা খণ্ড খণ্ড বরফ, পায়ের চাপে এক দিকে ডুবে যায়। ধীরে ধীরে পা ফেলবার উপায় নেই, এজন্য দ্রুত ছোটানোর উদ্দেশ্যে কুকুরকে চাবুক মারতে হচ্ছে নিষ্ঠুরের মতো। কোথায়ও অপেক্ষা না ক'রে যদি তারা লাফিয়ে লাফিয়ে বিপদ পার হয়ে যেতে পারে তবেই ভালো, নইলে বাঁচা অসম্ভব। কুকুরের উপরেই এখন সকল ভরসা।

একটু কোথায়ও বাধা পেলেই সবসুদ্ধ জলে প'ড়ে খরস্রোতে ভেসে যেতে হবে।

মরীয়া হয়ে ভাগ্যের সঙ্গে চলছে লড়াই। আর মাত্র পঞ্চাশ ধাপ—শেষ পঞ্চাশ ধাপ। কোনো মতে এটুকু দূরত্ব পার হ'তে পারলেই শক্ত নিরেট বরফের আশ্রয়ে ফিরে আসা। কিন্তু হায় রে ভাগ্য! একটা জায়গায় কুকুরেরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কারণ সামনের তুষারস্তূপ হাওয়ায় দুলছে। কুকুরেরা তা দেখে তার উপর উঠবে কি না ইতস্ততঃ করছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে যে আরও বিপদ সে খেয়াল নেই তাদের। ফলে যা হবার তাই হল, বাঁ-দিকের কুকুরটি আগে জলে প'ড়ে গেল, পরে ডান দিকেরটি। আর ঐ সঙ্গে স্লেজ গাড়ির একটি ধারও হেলে পড়ল জলের উপর।

সবই যায়! সাফল্যের কিনারায় এসে ভরাডুবি হয়! ডাক্তার কেন্ তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে কুকুরের গলার দড়ি কেটে দিতে গেলেন, কিন্তু সে অবস্থায় তা কি সম্ভব? শক্ত আশ্রয় কোথায়ও নেই পায়ের নিচে। উল্টে তিনি নিজেই গেলেন প'ড়ে। সেই কাদার মতো আধ-জমা ঠাণ্ডা লোনা জল। তার মধ্যে প'ড়ে কি বাঁচা যায়? কিন্তু বাঁচতেই হবে। ডাক্তার কেন্ প্রাণপণে সাঁতার কেটে কোনোমতে ভেসে থেকে হাতের ছুরির সাহায্যে কোনো রকমে একটি কুকুরের দড়ি কেটে তাকে মুক্ত করতে পারলেন; কিন্তু সে হল আর এক নতুন বিপদ। কুকুরটি কৃতজ্ঞতায় এমন অস্থির হয়ে উঠল যে প্রভুকেসুদ্ধ ডুবিয়ে মারে আর কি! তখন তিনি কুকুরটিকে ঠেলে দিয়ে স্লেজে ভর ক'রে উপরে উঠতে গেলেন; কিন্তু পারলেন না। দেখলেন তা একেবারেই অসম্ভব। তখন তিনি

উন্মাদের মতো সেই জলের চার দিকে সাঁতার কেটে কেটে দেখতে লাগলেন কোথায়ও উপরে ওঠার মতো শক্ত বরফ আছে কি না, কিন্তু যেখানেই শক্ত মনে ক'রে চাপ দিতে যান সেখানকার বরফই সে চাপ সহ্য করতে পারে না, ভেঙে যায়। এইভাবে চারদিকের হাল্কা বরফের বেষ্টনী ভাঙতে ভাঙতে জলের ক্ষেত্র আরও বেড়েই যেতে লাগল, আর ডাক্তার কেন্-এর ক্লান্তি ও অবসাদ যে কি পরিমাণ বাড়তে লাগল, তা না বলাই ভাল।

এইভাবে লড়াই করতে করতে অবশেষে ডাক্তার কেন্ আত্মরক্ষার আর এক উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি চিৎ হয়ে একখণ্ড বরফের উপর মাথা রেখে এবং স্লেজের উপর পায়ের ভর রেখে একটু একটু ক'রে ঠেলে শেষ পর্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থায় উপরে উঠে পড়লেন। সঙ্গে হান্‌স্ নামক এক এস্কিমো ছিল, সে তাঁকে শুশ্রূষা করতে লাগল। এই লোকটিই শেষে বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে কুকুরগুলোকে উদ্ধার করল।

কিন্তু বীর অভিযাত্রী ডাক্তার কেন্ ও তাঁর সঙ্গীদের সলিল সমাধির হাত থেকে এই একবার মাত্র উদ্ধার নয়। অতি অবাঞ্ছিত সেই বরফের কারাগারে আবদ্ধ জাহাজের আশ্রয়ে তখনকার মতো তাঁরা ফিরে তো এলেন, কিন্তু তারপর থেকে তাঁরা ভাগ্যের সঙ্গে যে লড়াই আরম্ভ করলেন তার তুলনায় ডুবে মরাই যেন বেশি ভাল ছিল। কারণ জাহাজে ফিরে এসে এমন একটি দিন গেল না যেদিন তাঁদের অনাহারে থাকতে হয়নি। এরপর থেকে এই বীর অভিযাত্রীর ডায়ারিতে যে সব বর্ণনা আছে তা অতি বেদনাদায়ক। কারণ যে অমানুষিক দুর্দশা তাঁরা ভোগ করেছিলেন তা শুনলে সাধারণ লোক অভিভূত হয়ে

পড়বে। মানুষ এমন বিভীষিকাপূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কি ক'রে লড়াই করতে পারে তা সে ভাবতেই পারবে না।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই ভীষণতম অগ্নি পরীক্ষায় রত থেকেও ডাক্তার কেন্ জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন, এবং পেরেছিলেন ব'লেই আর সবার সুখসুখবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তা না হ'লে তাঁরা কি আর বেঁচে থাকার কল্পনা করতে পারতেন?

কিন্তু মানুষ আর কত দুঃখ সহ্য করতে পারে? আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। আমরা আধুনিকতম তেনসিং হিলারির অভিযানের কথাও জানি। কিন্তু চূড়ায় ওঠার সাফল্য বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে মানুষের সহ্য করার শক্তি-সীমা। চূড়ায় উঠুন বা না উঠুন দলে দলে যে সব বীর অভিযাত্রী মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার চেষ্টা করেছেন এবং পারেন নি, এবং যাঁরা আর ফিরে আসেননি তাঁদেরও ঐ একই ইতিহাস। যাঁরা দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে বার বার যাত্রা ক'রে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন, বা যাঁরা আর ফিরতে পারেন নি, তাঁদের ইতিহাসও স্বতন্ত্র নয়।

তবু যাঁরা প্রথম এ দুঃসাহস করেছেন তাঁদের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁরা কত অল্প সম্বল, কত অল্প অভিজ্ঞতা, ও আত্মরক্ষার কত অল্প হাতিয়ার নিয়ে অজানা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

প্রাথমিক যুগের এইসব অভিযাত্রীকে আজকের দিনের তুলনায় কত বেশি অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে তা জানলে শিউরে উঠতে হয়। খাদ্য সম্পর্কে আমাদের আজন্ম সংস্কার যদি হঠাৎ একদিন ছাড়তে হয়; যদি রান্না করা মাংসের বদলে কাঁচা মাংস খেতে হয়;

যদি টাট্‌কা মাংসের বদলে এক বছরের পচা মাংস খেতে হয়; হঠাৎ যদি মরা ভালুকের পচা যকৃৎ খেতে হয়; যদি বহুদিনের মরা জন্তুর মাথা, নিজের পায়ের জুতো বা কোমরবন্ধ ভেজে খেতে হয়; তা হলে অবস্থাটা কেমন হয়, তা যে কল্পনা করতেও মন দমে যায়। এবং এসব খেয়েও যে বাঁচা যায় এও তো মস্ত বড় এক অভিজ্ঞতা। অথচ এই অভিযাত্রীদের এ সবই করতে হয়েছে, এবং তাঁদের তখন মনে হয়েছে ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন এমন সৌভাগ্য তাঁদের হত না, এবং এইসব অখাদ্য সবাই পরম তৃপ্তির সঙ্গে, এমন কি কাড়াকাড়ি করেও খেয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে অন্যায় যেটি হয়েছে সে হচ্ছে সঙ্গীকে হত্যা ক'রে তার মাংস খাওয়া। এ পৈশাচিক কাজ একজনই মাত্র করেছিল।

এই ভাবেই, মানুষের সহ্য করার সীমা কোথায়, সম্ভবত তার পরীক্ষা হয়েছে। এ সব সে বাধ্য হয়ে করেছে বটে, কিন্তু এ রকম দুর্বিপাকে পড়া অসম্ভব নয়, তা জেনেও তো সে এ পথে পা বাড়িয়েছে এবং জীবন্মৃত হয়ে ফিরে এসে থেমে যায়নি, আবার গেছে। এই উদ্যমের সংজ্ঞা কি? এ সাহসের নাম কি?

একে দুঃসাহস বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। কারণ আমরা দেখেছি, অভিযাত্রীরা দুর্গম পথে যাওয়ায় শুধু দুঃসাহসই দেখান নি, তাঁরা ভূমি আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ অবিরাম চালিয়ে গেছেন চরম বিপদের মুখেও। আসন্ন মৃত্যুর সীমানায় ব'সে তাঁদের অনেকেই ডায়ারি লিখে গেছেন সকল তথ্য উল্লেখ ক'রে। পরবর্তী অভিযাত্রীদের সুবিধার জন্য এবং মানুষের কল্যাণে তাঁরা এই কর্তব্য থেকে কখনো ভ্রষ্ট হননি। লিখে গেছেন "আমি মারা যাচ্ছি এখন" —পর্যন্ত।

যিনি বেঁচে ফিরে এসেছেন তিনি নিতান্তই দৈবাৎ বেঁচেছেন।

ডাক্তার কেন্-এর ডায়ারি থেকে তাঁদের অতি বেদনাদায়ক একটি অবস্থার কথা তুলে দিচ্ছি—

"ম্যাগোরি ও ব্রুকস্ দেখতে দেখতে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের খাদ্য এখন একমাত্র সিন্ধুঘোটকের মাংস। এস্কিমোদের কাছ থেকে ভিন্ন অন্য কোথাও এ মাংস পাবার উপায় নেই। আমাদের জন্য সামান্য কিছু মাংসের বিস্কুট আছে, আর তার সঙ্গে আমার একটি অতিরিক্ত খাদ্য বরাদ্দ আছে. সেটি আমারই বিশেষ খাদ্য, কারণ পিটার্সন খাওয়া বিষয়ে আমার মতো এমন উদার নয়। সে খাদ্য হচ্ছে কয়েকটি ইঁদুর, সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে চর্বির গোলায় জমিয়ে নিয়েছি।······কুকুরদের খাইয়েছি মরা কুকুরের মাংস। কথায় বলে কুকুরের মাংস কুকুর খায় না, কিন্তু ঠিকমতো পরিবেশন করতে পারলে খাওয়ানো যায়। কয়েকটি কুকুর অজ্ঞান হয়ে মারা গিয়েছিল, তাদের চামড়াগুলো রেখে দিয়েছিলাম সে সময়, তাই মাংসের অভাব হয়নি। কিন্তু এই এস্কিমো কুকুরের পক্ষে লবণাক্ত মাংস বিষের ক্রিয়া করে। এ পর্যন্ত আমরা ৫০টি কুকুর হারিয়েছি, কাল একটি কুকুর এই নতুন খাদ্য খেতে খেতেই মরে গেল। একটি দামী খাদ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই তার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সেটি মেরু অঞ্চলের এক ভালুকের মাথা, সেটি নমুনা-নিদর্শন বা স্পেসিমেন স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কেটে রাখা হয়েছিল। তার সঙ্গে কিছু পরিমাণ মাংসও ছিল। ব্রুকস্, উইলসন ও রিলেকে আমি সেই মাংস কাঁচাই পরিবেশন করলাম। প্রকৃত অবস্থা আর লুকিয়ে

লাভ নেই। গত দশদিন ধ'রেই পরিষ্কার বুঝতে পারছি এই অবস্থা আর বেশি দিন চলতে পারে না। বাঁচতে হলে আমাদের মাংস চাই-ই।

"ওরা সবাই মিলে ভালুকের মাথাটি খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে। ঐ ভালুকেরই যকৃৎটিতে ঘা হয়েছিল বলে সেটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কোনো কাজে লাগবে না ব'লে। সেইটি তারা এখন খাচ্ছে, আর তার সঙ্গে খাচ্ছে নাড়িভুঁড়িগুলো যা কুকুরকে না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। হিসেব ক'রে দেখা গেল এভাবে চললে আর তিন দিন পর্যন্ত কোনো রকমে এই খাদ্য দিয়েই চালিয়ে নেওয়া যাবে। বরাদ্দ হ'ল প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য মাত্র ৪ আউন্স ক'রে মাংস। তারপর আর কিছু সেই—সব শূন্য, সব অন্ধকার। রবিবার (৪ঠা মে) সব মাংস শেষ হয়ে গেছে।

"রুগীরা মৃত্যুর মুখে।

অস্ত্রপ্রয়োগে যাদের পা কেটে ফেলা হয়েছিল তাদের ক্ষত আবার কাঁচা হয়ে উঠছে।"

এরপর আর কি। চলল দিনের পর দিন এই একই ইতিহাস। অন্ধকারের ইতিহাস। সেই অন্ধকারে কোথাও একটুখানি আলোর রেখা নেই, শুধু ব্যাধি আর অনাহার। এই রকম সময় দু একটি চরম অবস্থায় এস্কিমোরা ওদের কিছু কিছু সাহায্য ক'রে গেছে। কিন্তু সে সাহায্য আর কতটুকু। কারণ এস্কিমোরা তখন নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না, কিছুদিন আগেই তারা একটা বড় দুর্ভিক্ষের কবলে প'ড়ে বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তাই বেশি কিছু করতে পারেনি। তবু কিন্তু এস্কিমোদের প্রশংসা করতে হবে। যত অপরিচিতই হোক, যত

দূরবাসীই হোক, মানুষের চেহারায় তারা যে মানুষই, এ পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের ঐ একটুখানি সহৃদয়তার মধ্যে।

প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই শেষ, কিন্তু ডাক্তার কেন্ নিজে কখনো আশা ছাড়েন নি। সে আশা তিনি তাঁর সঙ্গীদের মনেও সঞ্চার করতে পেরেছিলেন অনেকখানি।

শীত গিয়ে বসন্ত এলো। আবার পথ খুঁজে পাবার আশা জেগে উঠল সবার মনে। এবারে সবাই বললেন আর জাহাজে থাকা নয়, জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু 'যেতে হবে' ব্যাপারটা সোজা নয়। ১৩০০ মাইল গেলে তবে উদ্ধার পাবার আশা। পথ কখনো জলের, কখনো কঠিন বরফের। সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত হয়ে তাঁরা জাহাজ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নিলেন।

দিনটি ছিল রবিবার। সবাই নীরবে জাহাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তার কেন্ বাইবেল থেকে একটা অংশ পাঠ করলেন। এবং সঙ্গীদের উদ্দেশে একটি বক্তৃতা ।দলেন। পথের বিপদের কথাও জানালেন। কিন্তু তিনি তাঁদের এই ব'লে আশ্বাস দিলেন যে যদি উদ্যম থাকে, যদি আদেশ পালনে নিষ্ঠা থাকে, তা হলে বিপদকে নিশ্চিত পরাভূত ক'রে তাঁরা ১৩০০ মাইল দূরের লক্ষ্যস্থল গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছে যাবেন।

ডাক্তার কেনের এ আশা সফল হয়েছিল। পথের দুর্দশা অবর্ণনীয়, কিন্তু মনে ছিল শক্তি, আর নেতার প্রতি ছিল সবার অবিচলিত নিষ্ঠা, নির্ভরতা আর দুঃখ সইবার অপরাজেয় সাহস ও সহিষ্ণুতা। এত বড় দুঃসাহসিক প্রত্যাবর্তন-অভিযানে মাত্র একজন সঙ্গীকে তাঁরা হারিয়েছিলেন।

সে কি সহজ পথ? ৮৪ দিন ধ'রে খোলা আকাশের নিচে তুষার ঝড় আর বরফের বাধা ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। এই ৮৪ দিন পরে তাঁদের দুঃখের অবসান ঘটল। তাঁরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে আবার মাটির আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালেন।

তুষারবন্দী নেয়ারেসের বিপজ্জনক অভিযান

১৮৭৫ সালের কথা। আজ থেকে (১৯৪৯ থেকে) প্রায় চুয়াত্তর বছর আগের একটি দিন কল্পনা করা যাক। সে দিনটি ২৯শে মে। সে দিন ক্যাপটেন নেয়ারেস তাঁর দলবল নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে আর এক অভিযানে যাত্রা করলেন।

আমাদের দেশেও তখন অনেক প্রাচীন অর্থহীন রীতিনীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে।

যে বছর ক্যাপটেন নেয়ারেস অভিযানে বেরোলেন, ঠিক সে বছর আমাদের দেশের এক বালক কবি একটি গান লিখেছিলেন। কবির বয়স তেরো-চোদ্দ, নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যে গান লিখেছিলেন তার সঙ্গে এ সব অভিযানের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ৮০০০ মাইল দূরে ব'সে কবি যেন সেই অভিযাত্রীদেরই মর্মকথা প্রতিধ্বনিত করছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"আসুক সহস্র বাধা আসুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।"

মেরু অভিযাত্রীদেরও ঠিক এমনি সঙ্কল্প। সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে যাঁরা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন, এমন কি যাঁরা শুধু একটি ভাবের জন্য,

আদর্শের জন্য, চরম দুঃখ সহ্য করেছেন, তাঁরা কবিকে ছেলেবেলা থেকেই প্রেরণা জুগিয়েছেন। কবির চোখে এঁরা চিরদিনই মহৎ।

মানুষের সমাজে প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময় এই-জাতীয় সব নির্ভীক বীরদের আত্মত্যাগই মানুষকে ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে গেছে। তাই তো আমরা আজ নিশ্চিন্ত আরামে পৃথিবীর সকল পরিচয় জানতে পারছি। এ সব জ্ঞান আমাদের কাছে এত সহজ হয়েছে এঁদেরই আত্মত্যাগের ফলে। নইলে পৃথিবীর মানচিত্র সম্পূর্ণ আঁকা হত না, পৃথিবীটা যে কেমন তা হয় তো জানাই হত না।

চুয়াত্তর বছর আগের একটি দিনে ফিরে যাচ্ছি।

ক্যাপটেন নেয়ারেস (পরে সার জর্জ নেয়ারেস) উত্তর মেরুর দিকে যাত্রা করলেন। অভিযানের উদ্দেশ্য, উত্তর দ্রাঘিমার কত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় তা দেখা, মেরু কেন্দ্র পর্যন্ত যাওয়া যায় কি না তা দেখা।

অভিযানের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করা হয়েছিল, সঙ্গে ছিল দু বছরের উপযুক্ত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী। দুখানা জাহাজ—নাম অলার্ট ও ডিস্কাভারি। অভিযাত্রী সংখ্যা, অফিসার ও অন্যান্য লোক মিলিয়ে মোট ১২০ জন।

যাত্রার প্রথম দিকে সবই শুভ সূচক। আটলান্টিক পার হওয়া গেল নিরাপদে। জাহাজ চলতে লাগল গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূল বরাবর।

২২ শে জুলাই। ইউপারনাভিক ছাড়বার পর মেলভিল উপসাগর পারে জাহাজ পৌঁছল গিয়ে ইয়র্ক অন্তরীপে। এইখানে এসে পথের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো আশ্রয় ঘাঁটি তৈরি করা হল। এর উদ্দেশ্য—যদি বহু দূরে গিয়ে, কোনো দুর্ঘটনায় জাহাজ ছেড়ে হাঁটা-

পথে ফিরে আসতে হয়, তা হ'লে এ সব ঘাঁটিই তখন বিশেষ কাজে লাগবে। এতটা ভবিষ্যৎ ভেবে এমন ভাবে তৈরি হয়ে যাওয়া আগের কোনো অভিযাত্রীদলের পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

যা হোক, এর পর স্মিথ প্রণালী পার হয়ে স্যাবিন অন্তরীপ থেকে উত্তর দিকের পথ ক্রমে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে লাগল। দুদিকে হিম-শৈলের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে হচ্ছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে সবই গেল, এক ধাক্কায় ভেঙেচুরে সবই তলিয়ে গেল বুঝি।

একদিন সন্ধ্যায় এঁরা খুব সাবধানে একটি প্রণালী পার হয়ে চলেছেন, এমন সময় বরফের বেষ্টনী ক্রমে চেপে আসতে লাগল। এই সব ভাসমান বরফের ছোট ছোট পাহাড় অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, এর বেশির ভাগ অংশ জলে ডুবে থাকে, দেখা যায় না।

অবস্থা এমন হল যে আর বুঝি বাঁচা যায় না। অলার্ট জাহাজখানা বিরাট এক হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা খাবার উপক্রম হল। ক্যাপটেন নেয়ারেস উদ্বিগ্ন ভাবে ডিস্কাভারি জাহাজের ক্যাপটেন স্টিফেনসনকে ইসারায় জানালেন—সামনে বিষম বিপদ, সাবধান!

অসাধারণ কৌশলে জাহাজ চালিয়ে ক্যাপটেন স্টিফেনস্ন তো হিমশৈলকে এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু অলার্টের বিপদ ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। অলার্টকে ইতিমধ্যে একটা হিমশৈলের গায়ে নোঙ্গর করা হয়েছিল। স্রোতে ভাসমান বরফের খণ্ডটি প্রবল বেগে সে দিকে ছুটে আসতে লাগল। আর কয়েক মুহূর্ত। দুই হিম দানবের মাঝখানে চাপা প'ড়ে অলার্ট গুঁড়ো হয়ে যাবে। বাঁচবার কোনো উপায় নেই, কোনো পথ নেই। লাগল দুই বরফের পাহাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কা, জলস্থল কেঁপে উঠল সে ধাক্কায়।

কিন্তু দৈব ছিল নিতান্তই অনুকূল, কারণ দুই পাহাড়ের সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দেখা গেল রাজায় রাজায় যুদ্ধে কোন্ ফাঁকে উলু-খড় বেঁচে গিয়েছে। সামান্য এক চুলের দূরত্বে জাহাজখানা রক্ষা পেয়ে গেছে।

এই সংঘর্ষে ছুটে আসা হিংস্র শ্বেত দানবটাই চূর্ণ হল ; এবং তার ফলে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল, জাহাজের এগিয়ে যাওয়া সহজ হল।

এইভাবে গতিপথে একের পর এক হিমবাধার সঙ্গে লড়াই ক'রে ২৫শে অগস্ট তারিখে জাহাজ দুখানা গিয়ে পৌঁছল ডিস্কাভারি বন্দরে। ডিস্কাভারি জাহাজ এইখানে শীত কাটাবে ব'লে স্থির করল, অলার্ট এগিয়ে গেল আরও উত্তরে, তত উত্তরে তখনও কেউ যেতে পারেন নি। এই স্থানের দ্রাঘিমা সীমা হচ্ছে ৪২ ডিগ্রী ২৫ মিনিট উত্তর, ৬১ ডিগ্রী ৩০ মিনিট পশ্চিম। সেখানে সেই মেরু শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে শীত কাটাতে লাগল অলার্ট জাহাজ।

শীতের শেষে এলো বসন্ত, তখন স্লেজ ভ্রমণের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। এঁদের উদ্দেশ্য—যতটা উত্তরে যাওয়া যায়। সম্ভব হলে মেরু কেন্দ্র পর্যন্তই যেতে হবে। ক্যাপটেন নেয়ারেস ভেবে দেখলেন তা করতে হ'লে কোনো উপকূল বরাবর যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ উত্তরের দিকে একটানা জমি না পেলে স্লেজে যাওয়া যাবে না। সুতরাং জমির সন্ধান নেওয়াই হল তখন প্রধান কাজ।

তখনও শীত খুব বেশি, জাহাজ থেকে নেমে তখন বেশি দূর যাওয়া চলে না। ১ লা মার্চ (১৮৭৬) তারিখে আবহাওয়ার তাপ ০ ডিগ্রীর নিচে ৬৪ ডিগ্রী (মাইনাস ৬৪°) পর্যন্ত নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া। এত শীত সহ্য করা বড়ই কঠিন। জল জমে

০ ডিগ্রীতে। ততটা ঠাণ্ডাও আমরা কলকাতা শহরে বসে ভাবতে পারি না। কলকাতার আবহাওয়ার তাপ+৬ ডিগ্রী +৭ ডিগ্রী হলেই আমরা শীতে কাঁপি। আর এখানে তাপ ০ ডিগ্রীর নিচে নামতে নামতে —৬৪ডিগ্রী! অর্থাৎ জল জমানো ঠাণ্ডা থেকেও—৬৪ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা! এ ঠাণ্ডা মানুষের পক্ষেও কষ্টকর, সঙ্গে যে কুকুর ছিল তাদের পক্ষেও কষ্টকর। সে সময় কুকুরগুলোর অবস্থা দেখে মনে হল তারা আর চলতে পারবে না। বার বার যাত্রা ক'রেও তাদের একটু দূর গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছিল জাহাজে। ক্রমে শীত বেড়েই যেতে লাগল। থার্মোমিটারে দেখা গেল মাইনাস ৭৩°।

স্লেজ ব্যবহারের পরিকল্পনা এ দিকে কি ভাবে চলছে, তা জানিয়ে দেবার জন্য এবং ডিস্কাভারি জাহাজের স্টিফেনসনকে কিভাবে চলতে হবে, তার নির্দেশ দেবার জন্য লেফটেনাণ্ট ইগারটন ও রসনকে ডিস্কাভারি বন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, এবং ১২ই মার্চ তারিখে অলার্ট ছেড়ে ক্যাপটেন নেয়ারেস অভিযানে বেরোলেন।

কিন্তু এ যাত্রা শুভ হল না। কিন্তু তা না হলেও এই উপলক্ষে যে বীরত্ব, যে নির্ভীকতা, যে আত্মত্যাগ আর সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া গেল তা মেরু অভিযানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

নেয়ারেসের অভিযানের মাত্র এক দিন কেটেছে, এরই মধ্যে পিটার্সনের রক্ত জমে হাত পায়ে খিল ধ'রে গেল। গলার নিচে কোনো খাদ্য নামে না, কম্বলের পর কম্বল জড়িয়েও গায়ের কাঁপুনি থামে না, তদুপরি তিনি অতি বিশ্রী রকমের হিমাক্রান্ত হলেন।

বাঁচাতে হবে তাঁকে। দু জন অফিসার নিজেদের জামা খুলে পিটার্সনের গায়ে পরিয়ে দিলেন এবং তাঁদেরই চেষ্টার ফলে তাঁর দেহে

পুনরায় রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হ'ল। কিন্তু এত সত্ত্বেও তাঁর অবস্থার যখন বেশি কিছু উন্নতি হল না, তখন নিরুপায় ভাবে তাঁরা জাহাজেই ফিরে আসা স্থির করলেন।

কিন্তু বিপদ কাটল না। এর উপর ফিরে আসার পথে এক বিপর্যয়কারী ঝড়। তখন তুষার-উপকূলে সবাই মিলে এক গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। রোগীর অবস্থা কি হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যাবে। দেহের তাপ বজায় রাখতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা, কিন্তু কি ভাবে? বিষম সমস্যা।

কিন্তু সমস্যা সমাধান হ'ল। হ'ল আত্মত্যাগী সঙ্গীদের আন্তরিকতায়, নিষ্ঠায় আর মনের জোরে। ইগারটন আর রসন পালা ক'রে পিটার্সনের কম্বলের মধ্যে পিটার্সনকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে নিজ নিজ দেহের তাপের সাহায্যে পিটার্সনের দেহের তাপ রক্ষা করতে লাগলেন।

সঙ্ঘজীবনের স্বার্থহীন নিষ্ঠারই ছবি এটি।

১৫ই তারিখে তাঁরা রওনা হলেন সেই গর্ত থেকে। আরও ১৬ মাইল এগিয়ে গেলে তবে জাহাজ। নির্ভীক অভিযাত্রীরা এগিয়ে চললেন সকল বাধা ঠেলে। সেই বরফের পথ অসমান, দুর্গম। স্লেজ নিয়ে যাওয়া কঠিন। অথচ স্লেজে শুইয়েই রোগীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু উঁচুনিচু পথের এত ঝাঁকানি সহ্য হয় না, তাই তাঁকে নেমে পড়তে হ'ল স্লেজ থেকে। কিন্তু হাঁটবেন এমন শক্তি কোথায় তাঁর? এক বন্ধু বললেন 'আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে চেষ্টা কর এক-পা এক-পা ক'রে।'

কিন্তু এ ভাবেও যাওয়া কষ্টকর। স্লেজ একটু আগে আগেই

চলছিল, এমন সময় স্লেজসমেত কুকুরেরা প'ড়ে গেল এক বড় গর্তে। ভাগ্যিস পিটার্সন আগেই নেমে পড়েছিলেন।

দুঃসহ পরিশ্রম ক'রে স্লেজ ও কুকুরদের তো উদ্ধার করা গেল, কিন্তু তখন ঘটল আর এক অপ্রত্যাশিত বিপদ। কুকুরেরা হঠাৎ ক্ষেপে গেল। গর্তে প'ড়ে গিয়ে তারা এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে উদ্ধার পেয়েও তারা মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। তারা ভীতভাবে ছুটে চলতে লাগল নিজেদের ইচ্ছামতো। ওদের এখন সামলাবে কে? ইগারটন ওদের রাশ টেনে ধ'রে ছুটেছেন স্লেজের সঙ্গে, কিন্তু কিছুতে থামাতে পারছেন না। থামল অবশেষে এক বাধা পেয়ে। বরফের বাধা। সেখানে উঁচু বরফের দেয়াল দুদিক থেকে চেপে এসে পথ সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলেছে।

ইগারটন ও রসন খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন ফিরে এসে। কিন্তু তা কেটে গেল কয়েকদিনের বিশ্রামের পরেই। জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পিটার্সন হিমাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি আর বাঁচতে পারলেন না। সম্পূর্ণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে প'ড়ে থেকে তিন মাস পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

৩রা এপ্রিল (১৮৭৬) তারিখে অলার্ট জাহাজ থেকে দুটি স্লেজবাহিনী উত্তর এলাকায় তথ্যানুসন্ধান কাজে যাত্রা করল। কেপ জোসেফ হেনরি পর্যন্ত তারা একত্র গিয়ে—সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেল। কথা হ'ল প্রত্যেক দল নিজ নিজ নির্দিষ্ট পথে যাবে।

অভিযাত্রীদের মনে বিশ্বাস ছিল সাফল্য লাভ তাঁরা করবেন, তাই তাঁদের উৎসাহ ছিল অদম্য। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি—তাঁদের মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসতে কি নির্মম এক বিপদের হাতে পড়তে হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই ডিস্কাভারির দল অলার্টে পৌঁছে সেখান থেকে কয়েকজন অফিসার ও অনুচর সহ বরফের বিপজ্জনক পথে তথ্য সংগ্রহের কাজে যাত্রা করল। মোটের উপর তাঁরা তিন দলে ভাগ হলেন। একটির পরিচালনার ভার নিলেন ক্যাপটেন মার্কহ্যাম। এই দল পূর্বোক্ত জোসেফ হেনরি অন্তরীপ থেকে উত্তরে যাবে। দ্বিতীয় দলের নেতা লেফটেনাণ্ট অলড্রিক। এই দল গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে যাবে। তৃতীয় দল গড়া হ'ল ডিস্কাভারির কয়েকজন অফিসার ও অন্যান্য লোকদের নিয়ে। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল উত্তর গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তীর-ভূমির দিকে যেতে।

অলার্ট জাহাজ ছাড়বার ছ দিন পরে জোসেফ হেনরি অন্তরীপ থেকে বিদায় নিয়ে মার্কহ্যামের দল দুখানা নৌকো, কয়েকখানা স্লেজ ও প্রায় সত্তর দিনের খাদ্যসম্ভার সহ বরফের উপর দিয়ে উত্তর অভিমুখে রওনা হ'ল। এই অভিযাত্রীদের লক্ষ্য উত্তরের সর্বোচ্চ দ্রাঘিমার দিকে যতদূর যাওয়া যায়। এটাই ছিল নৌ কর্তৃপক্ষের আদেশ। তা ভিন্ন আরও সুসজ্জিত অভিযান চালিয়ে মেরুকেন্দ্রে যাওয়া চলে কিনা, তারও সম্ভাবনা পরীক্ষা করা। কঠিন অভিযান।

প্রথম থেকেই এ পথ বিপদসঙ্কুল। বরফের বাধা প্রায় অলঙ্ঘ্য। কুড়ুল এবং কোদাল দিয়ে পথের বাধা কেটে কেটে পথ তৈরি ক'রে নিতে হচ্ছে। সুতরাং তাঁরা যে এই অতি ভয়াবহ অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। দলের অধিকাংশ লোক একে-বারে খোঁড়া হয়ে পড়ল কয়েক দিনের মধ্যেই। মার্কহ্যাম বা সহকারী নেতা লেফটেনাণ্ট পার, কেউ কখনো স্কার্ভি রোগের চেহারা দেখেননি। কিন্তু তাঁদের মনে ঘোর সন্দেহ জাগল হয় তো বা একেই স্কার্ভি বলে।

সন্দেহ ক্রমে সত্যে পরিণত হ'ল, যা ভয় করেছিলেন তাই, অর্থাৎ এঁরা সবাই স্কার্ভিতে আক্রান্ত।

কিন্তু উপায় তো নেই। তাঁরা তাঁদের অভিযান বন্ধ করলেন না, উপরন্তু সকল দুর্যোগ ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

এঁরা ১৭ই মে তারিখে মেরুকেন্দ্র থেকে ঠিক ৩৯৯½ ভৌগোলিক মাইল দূরের একটি জায়গায় পৌছলেন। তখনও এতদূর উত্তরে কোনো মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি—এই কথাটি যখন দলের নেতা সবার সম্মুখে ঘোষণা করলেন তখন হর্ষধ্বনিতে সেই জনহীন জগতের বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। অভিযাত্রীরা মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন কি অস্থি-ভেদী হিমের পরিবেশে অবিরাম তুষারপাতের মধ্যে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন।

এগিয়ে যাওয়ার বাধা এবারে দুর্লঙ্ঘ্য। অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিকূল, নইলে মার্কহ্যাম অবশ্যই আরও এগিয়ে যেতেন। কিন্তু সে অবস্থায় আর এগিয়ে যাওয়া চলে না।

পরদিনই তাঁরা ঘাঁটির দিকে মুখ ফেরালেন।

এবং আসল বিপদ আরম্ভ হল এই সময়। সে অতি মর্মান্তিক কাহিনী।

শক্তি ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তির ভারে পা অবসন্ন হয়ে আসে, চোখে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। এমনি অবস্থায় চলতে চলতে মে মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত হাঁটায় সক্ষম রইলেন মাত্র সাতজন। দ্রুত অলার্টে পৌছনো দরকার, কিন্তু সাধ্য কি ?

২রা জুন পর্যন্ত এ'দের মধ্যে মার্কহ্যাম বাদে বেঁচে রইলেন মাত্র

ছজন রুগ্ন মৃতপ্রায় লোক আর দুজন অফিসার। তাঁদের পাঁচজনকে স্লেজে বহন করা হচ্ছে, বাকী চারজন প্রায় কুষ্ঠগ্রস্ত পঙ্গুদের মতন বুকে হেঁটে চলেছেন।

পরস্পর সহযোগিতা, সহানুভূতি ও নিয়মনিষ্ঠা এমন গভীর না থাকলে কি এমন অভিযান চালানো যায়? এই চরম বিপদে এঁরা স্থির করলেন, প্রথমে ভারী স্লেজগুলো সবাই ঠেলে ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে দেবেন এবং তাঁরা ফিরে গিয়ে আরও দুখানা স্লেজ ঠেলে ঠেলে আনবেন, প্রত্যেকখানা স্লেজ ঠেলবেন চারজন ক'রে লোক। এঁরা সবাই রুগ্ন, অথচ কর্তব্য করতে হবে যতক্ষণ প্রাণ আছে। এমনি অবস্থাতেও মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছিল পথ, তাতে পথের দৈর্ঘ্যই শুধু বাড়ছিল। উপরন্তু বরফ কাটা, পথ তৈরির কাজ তো রুটীন মাফিক কাজ, সব সময়েই সেটি করতে হয়েছে।

৫ই জুনের কাছাকাছি সময়—এঁদের ভবিষ্যৎ আরও কালো হয়ে এলো। যে ভাবে তাঁরা এগোচ্ছিলেন তাতে জাহাজে পৌঁছতে আরও তিনটি সপ্তাহ, এর মধ্যে অবিলম্বে সাহায্য না পেলে ততদিন রোগীরা কোনো মতেই বাঁচতে পারে না। এ রকম বেপরোয়া অবস্থায় ব্যবস্থাও বেপরোয়া হওয়া চাই। একটি মাত্র উপায় তখন তাঁদের হাতে আছে, সে হচ্ছে তাঁদের মধ্যেকার কেউ যদি জীবন বিপন্ন ক'রে একা এগিয়ে গিয়ে সাহায্যের বন্দোবস্ত করতে পারেন।

মহৎ হৃদয় লেফটেনান্ট পার বললেন, 'আমি যাব'। এবং তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই তাঁর কর্তব্য পালন করতে পেরেছিলেন। নিজের

কথা একবারও না ভেবে, রুগ্ন দুর্বল অবস্থাতেও তিনি একা সেই বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ জনমানবহীন পথে যাত্রা করেছিলেন।

রুগ্ন দুর্বল অবস্থাতেও তিনি একা সেই বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ জনমানবহীন পথে যাত্রা করেছিলেন।

বীরত্বের এই মহৎ দৃষ্টান্ত চিরদিন স্মরণীয়। কর্ত্তব্য সম্পাদন অথবা মৃত্যু—এই পণ ছিল তাঁর। যে-কোনো মুহূর্তে পথের উপর

অবসন্ন দেহ এলিয়ে পড়তে পারে, তারপর সেই নিঃসঙ্গ মেরুমরুর ভয়াবহ নির্জনতার মাঝখানে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, সেই দেহের উপর তুষারের পাহাড় জমতে থাকবে, এরই সম্ভাবনা ছিল বেশি। কিন্তু তিনি তা ভাবলেন না, তিনি সঙ্গীদের জীবন রক্ষার কথাই আগে ভাবলেন।

এই স্বার্থত্যাগের শিক্ষা বড় শিক্ষা। এটি একটি বড় সংস্কৃতি বা কাল্‌চার বহুদিনের অভ্যাসে যা মানুষের সকল সত্তায় মিশে যায়, মজ্জায় প্রবেশ করে। এ থেকে সবার শিক্ষালাভ করা উচিত। কবে কোন্ অতীতে এক নির্জন মরুদেশের এক অল্পখ্যাত ব্যক্তির আত্ম-ত্যাগের বাণী শতাব্দা পার হয়ে আমাদের মনে মনুষ্যত্বের অপরূপ এক উজ্জ্বল ছবি জাগিয়ে তুলছে। কোটি কোটি মানুষের অরণ্যে কোথায় তুচ্ছ একটি রুগ্ন মানুষ এক দিন নির্মম মেরু-তুষারের পথে তাঁর চেয়েও বেশি রুগ্ন কয়েকজন মানুষের জন্য মৃত্যুপণ করে-ছিলেন, সেই সামান্য একটি খবর আজও সেই অতীতের অন্ধকার পার হয়ে আমাদের মনকে অভিভূত করে। মানুষ যে কত বড় তা স্মরণ করিয়ে দেয়। লেফটেনাণ্ট পারের সেই আত্ম-ত্যাগের-কল্পনায়-উজ্জ্বল চোখ দুটির কথা ভাব। সেই অনাহারে, অতিশ্রমে অবসন্ন দুর্বল মানুষটির মহৎ লক্ষ্যে এগিয়ে চলার ছবিটির কথা ভাব।

তিনি চলেছেন। পিছনে পড়ে আছেন তাঁর দিকে চাওয়া মুমূর্ষরা। তাঁদের অবিলম্বে সাহায্য চাই। তাঁদের জীবন নির্ভর করছে পার-এর সাফল্যের উপর। অতি গুরুদায়িত্বের বোঝা স্বেচ্ছায় বহন ক'রে চলেছেন লেফটেনাণ্ট পার। জীবন তরণী তিন সপ্তাহ হাঁটা পথের

দূরত্বে। সেখানে যাঁরা আছেন তাঁরা এদিকের খবর কিছুই জানেন না। এই দুয়ের মাঝখানে ভয়াল প্রকৃতি, আর তার সঙ্গে প্রতিপদে লড়াই ক'রে চলেছেন নিঃসঙ্গ রুগ্ন পথিক। একদিকে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া, আর এক দিকে আশার আলো—এই দুই দ্বীপের মাঝখানে দুস্তর তুষার সমুদ্র। এই সমুদ্রে সেতু বাঁধতে চলেছেন একা মানুষটি।

মানুষের মনোবল মানুষকে কত ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে তা বোধ হয় আজও সম্পূর্ণ জানা যায় নি।

লেফটেনাণ্ট পার চলেছেন। পথ আর ফুরোয় না, ফুরোয় না আশাও। এমনি ভাবে ২০ মাইল পথ অতিক্রম করলেন তিনি, তার পর একটুখানি বিশ্রাম ও সামান্য কিছু খেয়ে নেওয়া। এতটা পথ এসে ঘাঁটিতে পৌঁছনোর আশা তাঁর বেড়ে গেছে।

২৪ ঘণ্টা ধ'রে মোট ২৭ মাইল পথ হেঁটে পার এসে পৌঁছলেন তাঁর লক্ষ্যস্থলে এবং এসেই কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করলেন। পার-এর চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন খবর ভাল নয়।

অবিলম্বে সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। তখুনি লেফটেনাণ্ট মে এবং ডাক্তার মস্ তুষার পাদুকা প'রে ওষুধপত্রসহ স্লেজে রওনা হয়ে গেলেন। দুপুর রাত্রের কিছু আগে ক্যাপটেন নেয়ারেসও রওনা হলেন একটি দল সঙ্গে নিয়ে। মে এবং মস্ বহু বাধা পার হয়ে পৌঁছে গেলেন মার্কহ্যামের ঘাঁটিতে। পার একা রওনা হয়ে এসে খবর দিলেন এবং আর্তদের কাছে সাহায্য পৌঁছে গেল—মোট সময় লাগল মাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টা। তাঁরা যখন পৌঁছলেন তখন আর্তদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সবাই জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ধুঁকছিলেন। সাহায্য পেয়ে সবাই বেঁচে গেলেন। মারা গিয়েছিলেন জর্জ পোর্টার।

পরদিন নেয়ারেসের দলও পৌঁছে গেল সেখানে এবং তাতে সবার মনে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হল। নেয়ারেস দেখলেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুখানা স্লেজে চারজন রোগীকে চাপিয়ে মার্কহ্যাম ও অন্য পাঁচজন সঙ্গী সেগুলোকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। স্লেজ দুখানার একখানা জরুরি জিনিসে বোঝাই, এবং একজন রোগী তার উপরে। দ্বিতীয় স্লেজখানা আধমাইল পিছনে, সেখানাও প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে বোঝাই, এবং তার উপরে একজন রোগী শুয়ে আছে। যে চার জন হেঁটে চলেছেন তাঁদের কষ্টের সীমা নেই, দেখে মনে হ'ল মরণের আর বেশি দেরি নেই। তাঁদের পায়ের রক্ত জমে খিল ধ'রে গেছে। তাঁরা তবু হেঁটে চলারই চেষ্টা করছেন প্রাণপণে, কারণ যাঁরা স্লেজ ঠেলছেন তাঁদের বোঝা আর বাড়ালে তাঁরাও যে অকেজো হয়ে পড়বেন।

এই হতভাগ্য রোগীরা প্রতিদিন সকালে প্রধান দলের কিছু আগে রওনা হয়ে আসেন, কেননা নিজেদের শক্তির উপর আর তাঁদের বিশ্বাস নেই, পথে কোথায়ও আটকা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। এ রকম বিপদ সত্যই ঘটেছিল কয়েকবার এবং তখন অনুসরণকারী প্রধান দল তাঁদের উদ্ধার করেছে। তাঁরা দুঃখের হাসি হেসে পুনরায় যাত্রা শুরু করেছেন সেই বিপজ্জনক পথে।

সবাই অবসন্ন, কিন্তু সবাই সবাইকে সাধ্যমতো সাহায্য ক'রে চলেছেন। মার্কহ্যাম তাঁর দল নিয়ে একদিকে এই দুঃখ ভোগ ক'রে চলেছেন। অন্যদিকে অলড্রিক তাঁর দল নিয়েও অনাহারে এবং ব্যাধিতে সমানভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁরা চলেছেন গ্রিনেলল্যাণ্ডের উত্তর উপকূল ধ'রে। তাঁরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। স্কার্ভি রোগ দেখা

দিয়েছে এবং আনুষঙ্গিক অন্য সব অসুবিধাই আছে। একবার অবস্থা এমন খারাপ হয় যে আড়াই মাইল পথ চলতে তাঁদের পুরো ন'ঘন্টা দুঃসাধ্য পরিশ্রম করতে হয়েছে।

অবস্থা শেষে এমন হল যে তাঁদের আটজনের মধ্যে তখন মাত্র দুজন—অলড্রিক ও অন্য একজন মাত্র হাঁটতে সমর্থ। অন্য দুজন ব'সে ব'সে কখনো বা অন্যদের ঘাড়ে ভর দিয়ে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছেন। বাকী চারজন শেষ পর্যন্ত স্লেজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক দুঃখ ভুগে ধীর গতিতে চ'লে এই হতভাগ্য দল ফিরে এলো মূল ঘাঁটি জোসেফ হেনরি অন্তরীপে।

এখান থেকে অতঃপর আর কোথায়ও যাওয়া এখন সম্ভব নয়। দলে একমাত্র শক্ত লোক ছিলেন অ্যাডাম আইলস। তিনি বললেন আমি একা যাব অলার্ট জাহাজে—ঠিক যেমন লেফটেনাণ্ট পার একা গিয়েছিলেন সাহায্য সংগ্রহে।

কিন্তু তাঁকে আর যেতে হল না, কারণ ইতিমধ্যে নেয়ারেস অলড্রিক ও তার বাহিনীর খোঁজে একটি সন্ধানী দল পাঠিয়ে ছিলেন, সেই দল এসে পৌঁছান এদের ঘাঁটিতে। ভাগ্যের জোর বলতে হবে। কারণ অ্যাডাম আইল্‌স যদি রওনা হয়ে যেতেন এবং এদের দেখা না পেতেন, তা হলে কি হ'ত সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থাৎ তিনি আর ফিরতেন না। কারণ ঠিক এর পরেই বরফ গলতে শুরু করেছিল এবং তাতে তাঁর পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

খবরটা পাওয়া গেল পার ও ফিলডেনের কাছ থেকে। তাঁরা এর ঠিক চব্বিশ ঘন্টা পরে সেই পথে আসেন। তাঁদের মুখে শোনা গেল সে পথে তুষার গলা ঠাণ্ডা জল পার হতে তাঁদের কোমর পর্যন্ত ডুবে

যাচ্ছিল। এক এক সময় তা থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। তাঁরা বললেন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শক্ত সমর্থ লোক ভিন্ন সে পথে আর কারো যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তৃতীয় যে দলটি ডিস্কাভারি জাহাজ থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে গিয়েছিল, তার অবস্থাও কিছুমাত্র উন্নত নয়। এই দলের নেতা ছিলেন বোমণ্ট। এদের মধ্যেকার জেমস হ্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই স্কার্ভিতে আক্রান্ত হন এবং এতই পীড়িত হয়ে পড়েন যে লেফটেনাণ্ট রসনের অধীন তাঁকে একখানা স্লেজে ক'রে পোলারিস উপসাগরের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রসনের এই ছোট দলের মধ্যেও তুজন ব্যক্তি স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন অগত্যা রসন, এবং রেনার নামক আর এক সঙ্গী সেই তুর্গম পথে স্লেজ টানায় রত হলেন। আর এক বিপদ হল এই যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের খাদ্য গেল ফুরিয়ে, এবং রসন আক্রান্ত হলেন তুষার অন্ধতায়। তুষারের উজ্জ্বল শাদায় চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ অনেক সময় অন্ধ হয়ে যায়। কাজেই এর পরের তুদিন তাঁকে চোখ বেঁধে নিয়ে ঠিক অন্ধের মতোই পথ চলতে হল।

অবশেষে পোলারিস উপসাগর!

কিন্তু হ্যাণ্ড ইতিমধ্যে এমন তুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁর আর বাঁচবার উপায় ছিল না। ফিরে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা গেলেন।

অন্যান্য রোগীদের অবস্থা ভালর দিকে যেতে লাগল। তাঁদের লেফটেনাণ্ট ফালফোর্ডের তত্ত্বাবধানে রেখে রসন বোমণ্টের সন্ধানে বেরোবেন স্থির করলেন। তাঁর আশঙ্কা, বোমণ্টের দল নিশ্চয় খুব

বিপন্ন হয়ে পড়েছে কোথায়ও। তিনি এক ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একখানা স্লেজ সহ তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলেন।

রসনের আশঙ্কাই সত্য। তিনি দেখলেন বোমণ্টের দল অসহায় হয়ে পড়েছে। অনেকের স্কার্ভি দেখা দিয়েছে, অধিকাংশ লোকেরই আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। এঁরা অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো ফল হল না, অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। হাতে পায়ে প্রবল ব্যথা, হাঁটা বড়ই কঠিন। অনেকে বুকে হেঁটে চলতে লাগলেন। কিন্তু এর জন্য কারো মুখে কোনো অভিযোগ নেই। এমন অবস্থাতেও তাঁদের মনে আশার আগুন নিবে যায়নি—আশ্চর্য!

যাঁরা বুকে হাঁটতেও অক্ষম, তাঁদের স্লেজে টানা হচ্ছে, শেষ নিশ্বাস না পড়া পর্যন্ত তাঁরা আশা ছাড়বেন না।

১০ই জুন তাঁরা এসে পৌঁছলেন রোবসন প্রণালীর মুখে, রিপাল্‌স্‌ নামক বন্দরে। কিন্তু তখন তাঁদের মধ্যে মাত্র বোমণ্ট এবং গ্রে কর্মক্ষম ছিলেন। এখানে এসে তাই পূর্বপরিকল্পনা বদলাতে হ'ল বাধ্য হয়েই। পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত বোমণ্টের অভিপ্রায় ছিল পোলারিস উপসাগরে পৌঁছনো, কিন্তু এই সঙ্কটকালে সে অভিপ্রায় ত্যাগ ক'রে তিনি তুষারীভূত প্রণালীর উপর দিয়ে অবিলম্বে অলার্ট জাহাজে যাওয়া স্থির করলেন,—কারণ দ্রুত গমনের উপরেই তাঁদের জীবন নির্ভর করছে।

অতএব অতি জরুরি ভিন্ন আর সব জিনিস ফেলে, ছোট্ট একটি দল গ্রীনল্যাণ্ড তীর ত্যাগ ক'রে বিপজ্জনক পথে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর বোঝা গেল এ পথে যাওয়া যাবে না, বরফ এত শক্ত নয় যার উপর হাঁটা চলে, এবং মাঝে মাঝে জল। বোমণ্ট একা হ'লে, অথবা সঙ্গীরা সমর্থ হ'লে পথের বিপদ অগ্রাহ্য ক'রেও পারে যাবার চেষ্টা

করতেন; কিন্তু সঙ্গীরা দুর্বল, এ অবস্থায় এ পথে নিশ্চিত মৃত্যু। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁরা আবার ফিরে এলেন সেই দুর্ভোগের আশ্রয়ে।

পোলারিস উপসাগর—যেখানে গেলে বাঁচা যেতে পারে—সে স্থান ৪০ মাইল দূরে, এবং স্লেজ টানতে সমর্থ একমাত্র বোমণ্ট এবং গ্রে। এ ভাবে অতটা পথ যাওয়া কি সম্ভব? কিন্তু আশা ছাড়া যায় না, ব'সে ব'সে হা-হুতাশ করা মূর্খতা, দেহে যতক্ষণ প্রাণের চিহ্ন থাকবে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে নির্মম নিয়তির সঙ্গে।

রওনা হলেন তাঁরা। অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করতে করতে ২৪শে জুন তাঁরা এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন যেখান থেকে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে ধৈর্যের শেষ সীমা বহুক্ষণ আগেই পার হয়ে গেছে, দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের দেহেও আর এক বিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই।

লেফটেনাণ্ট বোমণ্ট তাঁর ডায়ারিতে লিখছেন—"আজ মনে হয়েছিল আমাদের শেষ যাত্রা শুরু করেছি, কারণ জোন্‌স্‌ এবং গ্রে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ায় আমি স্থির করলাম সমতল তীর ভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে এদের রাখব এবং আমি একা যাব পোলারিস উপসাগরে সাহায্যের প্রত্যাশায়। যদি সাহায্য না পাই তা হ'লে ফিরে যাব এবং গিয়ে জোন্‌স্‌ ও গ্রেকে ঘাঁটিতে পাঠিয়ে রোগীদের সঙ্গে আমিই থেকে যাব।"

কিন্তু এ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার দরকার হয়নি, কারণ তাঁরা জানতেন না যে সাহায্য খুব কাছেই ছিল। বোমণ্ট কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলেন দূরে দিগন্ত রেখার দিকে কিছু যেন নড়ছে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে সাহায্যকারী দলকেই

তিনি দেখছেন। তিনি সে দিকেই তাকিয়ে রইলেন এবং একটুক্ষণ পরেই চলমান সেই চিহ্ন স্পষ্টতর হয়ে এলো, তিনি বুঝতে পারলেন কুকুরটানা স্লেজ ও মানুষের দল সেটি। আরও একটু পরে রসন ও কোপিন্‌জার এসে দাঁড়ালেন তাঁর সম্মুখে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি।

১লা জুলাই তাঁরা গড বন্দরে পৌঁছলেন। আপাতত তাঁরা দুঃখের হাত থেকে কিছু পরিমাণ বেঁচে গেলেন, যদিও চার্লস পল নামক একজন অভিযাত্রী এই সময় মারা গিয়েছিলেন।

এখন একমাত্র অলার্ট জাহাজেই সাতাশ জন অভিযাত্রী রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মারাত্মক রকমের স্কার্ভিতে ভুগছেন তাঁরা। তাঁদের দ্বারা কোনো কাজই সাধ্য নয়। স্লেজ-বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে, উত্তর দিকে ভূমির চিহ্ন নেই, মেরু তুষার সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য এবং জাহাজ যতদূর যেতে পারে এমন কোনো জায়গা থেকেই স্লেজের সাহায্যে মেরুকেন্দ্রে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এই সব বাধাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। নেয়ারেস তাই তথ্যানুসন্ধানের কাজ বন্ধ ক'রে বরফ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ অভিমুখে যাওয়া স্থির করলেন। কারণ আরও একটি শীত এই অঞ্চলে কাটানো আর সম্ভব ছিল না।

এ অভিযান এখানেই শেষ হল।

কিন্তু সম্পূর্ণ সফল না হলেও অভিযান নিষ্ফল হয়েছে বলা চলে না। কারণ অন্যান্য অনেক তথ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক তথ্য যেটুকু সংগ্রহ করা হ'ল তার দাম কম নয়। এই অভিযানে গ্রিনেলল্যাণ্ডের উত্তর তীর ভূমির সমস্ত রেখাটি এবং গ্রীনল্যাণ্ডের তীরভূমির প্রায় ১০০

[illegible]ইল বরাবর মানচিত্র তৈরি হয়ে গেল এবং নেয়ারেস এই সর্বপ্রথম মেরুকেন্দ্রের আরও কাছে যেতে সক্ষম হলেন।

নেয়ারেস ও তাঁর দল এই এগারো মাস ধ'রে যে দুঃখদুর্দশা সহ্য করলেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। এঁদের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়নি সেটাই অভিযানের বড় কথা নয়। বড় কৃতিত্বের পথ সব সময়েই ঠিক এমনি কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকে, কঠিনতম বিপদের মধ্যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় লাভের সুযোগ পাওয়া যায়।

আর একটা কথা। ফ্র্যাঙ্কলিন, রিচার্ডসন, নেয়ারেস, পার, এঁরা সবাই সাধারণ লোক ছিলেন। এঁরা এঁদের বাল্য বয়সের ক্রীড়া-পটুত্বই পরবর্তী কালে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। মনুষ্যত্ব কারো কাছে এঁদের শিখতে হয় নি, কর্তব্যনিষ্ঠাই এঁদের মনে মনুষ্যত্ব জাগিয়েছে।

আজ আমরা ঘরের নিরাপদ আরামে ব'সে মানচিত্র অনুশীলন করি, কিন্তু এই মানচিত্র রচনার পিছনে কত মানুষের মহৎ আত্মত্যাগ, কত কঠোর সাধনা, লুকিয়ে আছে তা জানি না। এ সাধনা আজও চলছে, অবিরাম চলছে। ভূমণ্ডলের মানচিত্র তৈরির কাজ আজও শেষ হয়নি।